সুখময়ের স্বপ্ন

মাণিক চট্টরাজ

প্রাপ্তিস্থান
বোলপুর নাট্যসারথী
বোলপুর
বীরভূম

পরিবেশক
ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট
১২/১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
(দ্বিতল)
কলকাতা ৭০০০৭৩

SUKHAMOYER SWAPNA
Short Stories

প্রকাশক ঃ
শঙ্কু চট্টরাজ

গ্রন্থস্বত্ব
দীপালী চট্টরাজ

প্রথম প্রকাশ
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ২৫শে কার্তিক, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ ঃ
সুব্রত চৌধুরী

ব্লক ঃ
বীণাপাণি প্রসেস্
২৫, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০০০৬

মুদ্রণ ঃ
লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন,
কলকাতা ৭০০০০৬

সুখময়ের স্বপ্ন

আষাঢ়ের সন্ধ্যা, কয়েকদিন জোলো ঝোড়ো হাওয়া বইছে দাপটে। আউলী-বিউলী বাতাসে কতুরে উঠছে গর্ভিনী মেঘের ডাক। সঙ্গে সঙ্গে সিপ্‌সিপিনী বৃষ্টি, হাড়কাঁপুনি জার, চারদিকে অন্ধকার ফোঁস ফোঁস করছে। গ্রামবাসীরা নিজগৃহের কোন কোণে গুঁড়ি সুঁড়ি মেরে পড়ে আছে কে জানে!

প্রাণীকুল পরিত্যক্ত নির্জন প্রান্তরে অন্ধকারে মোরামের সড়ানে কড়্‌কড়্ সর্‌সর্ শব্দ তুলে একটি মোষের গাড়ি ধীর মন্থর গতিতে পুব থেকে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে। মোষের চোখ দু'জোড়া অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলে হাঁপ ছেড়ে ছেড়ে কশায় ফেনা ঝরিয়ে ভারী লোমশ পায়ে থপ্‌থপ্ করে চলতে চলতে মোষ জোড়া হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

সামনের রাস্তায় জলে-বালিতে মাখামাখি করে পরস্পর পাকে জড়িয়ে শঙ্খলাগা একজোড়া সাপসাপিনী সাটপাট দিয়ে রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ী। গাড়ীর মাথায় ছেঁড়া মিলিটারী ওভারকোটে সর্বাঙ্গ ঢেকে, দু'কান গামছায় বেঁধে মাথলীসমেত মাথাটি হাঁটুতে গুঁজে দিয়ে জলের ঝাপ্‌টা থেকে রক্ষা পাবার প্রয়াস পাচ্ছিল —টাকু মোড়লের মাহিন্দার অনুকূল বাগ্‌দী।

মোড়লের নূতন বাড়ী উঠবে। লাউতাড়ার তিলিদের পুকুরপাড়ে স-সার চেরানো তালকাঁড়ি পড়ে আছে। মোড়লের মন ক-দিন থেকেই গুল্‌গুল্ করছিল—যেকোনো দিন চুরি হয়ে যেতে পারে: ঝাল ফুলুরি বিড়ি পান খেতে নগদ পাঁচ টাকা, এক পুটুলি মুড়ি আর সেই সঙ্গে একটা গোটা বোতল কবুল করে, অনুকূলকে তালকাঁড়ী আনতে রাজি করিয়েছে।

গাড়ী থামতেই অনুকূলের জড়তা কাটল; চোখ কচ্‌লে বেশ বড় করে চিরে চিরে গাড়ী থামার কারণ অনুসন্ধান করতেই ওর নজরে পড়ল, এক জোড়া লতা গলাগলি করে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে মা মনসাকে পেন্নাম করে গাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে

অনুকূল ডাকল—'সুখো ও সুখো, ঘুমুলি ?" গাড়ীর উপর জব্‌জবে ভিজে ত্রিপলে ঢাকা একটি মনুষ্যদেহ অনুকূলের ডাকে পাশ ফিরে শোয়। মোষ জোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুরুত্‌ চুরুত্‌ করে মুত্রত্যাগ করতে থাকল। কি আপদ! অনুকূলের মেজাজ খিঁচিয়ে উঠল, চেঁচিয়ে ডাকল, "শালো, কানা কুকুরের মতো কাত মেরে প'ড়ে থাকলে চলবে? কী করে বাড়ী যাবা যাও!"

সুখো ওরফে সুখময় সাহা বয়সে নবীন, স্বাস্থ্যে ঘাটের মড়া, তাড়ি পাড়তে গাছ থেকে পড়ে পাঁজরের ত্ব'খানি হাড় তুবড়েছে। তেল-জলের টানাটানিতে, গরম গরম চুণে-গুড়ে জেওলের আঠার প্রলেপও বাঁকা পাঁজরের হাড় সোজা হয়নি।

সুখময়ের বাবা ছিটিয়াল কবিয়াল। মুনিষ হিসাবে বড়ই অলস। মনিবের আলগুঁড়িতে বসে সদাই যোজনা করে গান। সুখময়-জননী যজ্ঞেশ্বরীর ফাটা গোড়ালীর লাথি কোঁত করে হজম ক'রে এখন শ্রীধাম নবদ্বীপে এক তাঁতগাড়াতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানকার সংবাদও ভাল নয়! যোজনা অব্যাহত থাকায় সুতো ছেঁড়ার, গিঁট পড়ার বহর বেড়েই চলেছে।

উপার্জনশীল পুরুষ বলতে একজন ছিল, সে সুখময়। সবেমাত্র লোকে ওকে গোটা মুনিষ ভাবতে শুরু করেছিল। ভরতপুরে তাড়ি পাড়তে গিয়ে যেদিন সুখময় মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে বসল, সেদিন থেকেই ওদের সংসারে অনটনের সঙ্গে অনশনও শুরু হ'ল।

চালার এককোণে ত্বটো ছাগল বাঁধা থাকত, ও ত্ব'টো পেটে ঢুকতেই সুখময় ওদের স্থান দখল করল। বেলা পড়লে মা ধান সিঁকে দিয়ে বাড়ী ফিরতো। কাঠিমুঠি জ্বেলে জননী যজ্ঞেশ্বরী মাড়েভাতে ত্বটো ফুটিয়ে একবাটি যখন সুখময়ের মুখের কাছে ধরতো, তা দেখে সূর্যদেব হাসতে হাসতে ডুব দিতেন। সারাটা দিন শালিখ পাখির ছা-এর মতো খিদেয় চিঁচিঁ করে পড়ে থাকতো সুখময়। পেটভাতায় বন্ধক থাকলো ছোট ত্বই ভাই-বোন মোড়লদের বাড়ি।

ইদানীং জননী যজ্ঞেশ্বরী নতুন করে চোলাই মদের কারবার শুরু

করেছে টাকু মোড়লের মূলধনে। সারাদিন ধিকিধিকি জ্বাল দিয়ে জল কেটে দু'বোতল নামায় মা ষণ্ডেশ্বরী। সুখময় নোলা বাড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এক-আধ দিন গরম গরম একপাত্র মাল সুখময়ের তৃষিত কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে নিজে এক ঢোঁক গিলে শুয়ে পড়তো জননী ষণ্ডেশ্বরী। এত করেও পেট ভরে না। অবশেষে টাকু মোড়লের কৃপায় যণ্ডেশ্বরীর পেট ভরে বাচ্চা এল। লোকে যে যাই বলুক, ষণ্ডেশ্বরী বাঁজা বা বিধবা নয়, সধবা।

গিরগিটির মতো শুয়ে শুয়ে নিরুপায় সুখময় তার বেজম্মা নতুন ভাই-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। একুশে যেতে না যেতেই তার মা ধান ভানতে বের হয়। নবজাতক সুখময়ের পাশে শুয়ে হাত-পা ছোঁড়ে। মাঝে মাঝে ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে কাঁদে। সুখময়েব যন্ত্রণা বাড়ে। ভাইয়ের মুখে সে কড়ে আঙুলটা ধীরে ধীরে চালান করে দেয়। সে চকচক করে ওর কড়ে আঙুলটা চোষে। সুখময়ের মজা লাগে। ক্ষুধা-যন্ত্রণায় শায়িত সুখময় জম্মা-বেজম্মার ফারাকটুকু ধরতে পারে না। কতকাল আর সে লতার মতো ধুলোয় গড়াবে!

মরণের কোলে শুয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখে সুখময়। ও আবার উঠে দাঁড়াতে চায়, পাঁজর ভরে নিঃশ্বাস নিতে চায়। টাকু মোড়লের কাছে থেকে বন্ধকী মাকে ছাড়িয়ে এনে ও বলতে চায়, "মাগো, তু আমার বেজম্মা ভাইটাকে দুধ দে, ভাত কাপড়ের দুখ ঘুচুই আমি।" ঢেঁকিশালে ছেঁড়া চটের উপর সুখময়ের স্থায়ী শয্যা রচিত হয়। শুয়ে শুয়ে গোড়ের পাড়ের শিবঠাকুরকে ডাকে সুখময়।

মনে পড়ে, সেদিন এক শীতের সকালে এক পুঁটলি হেলেঞ্চা শাক তুলে একমাত্র পরিচ্ছদ গামছায় বেঁধে উলঙ্গ দেহে শিবঠাকুরের ঘরেব দিকে তাকাল। শিবলিঙ্গকে ঘিরে কালো পাথরের গোলাকার বৃত্ত। চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো বেলপাতা, মেঝের ফাটলে বেশ কিছু ধান আর ছোলাগাছ গজিয়েছে। ভর-সকালে শীতের সূর্যের রোদ গায়ে মেখে ফুড়ুৎ করে এসে একজোড়া চড়াই পাখি শিবলিঙ্গের চূড়ায় বসে দু'চারবার ঠোঁট ঘষে আবার উড়ে গেল। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে

তাকিয়েছিল সুখময়। নির্বিকার মহাদেবের মতলব ঠাওর করতে পারে নি। আজও কোন সাড়া পেল না। সাড়া পেল টাক্ মোড়লের।

বয়স পঞ্চাশ। মোড়লের গায়ে সবুজ ফতুয়া এবং পরনে নীলেনের গেরুয়া রঙের লুঙ্গী। ঝামা-ঘষা চোয়াল, মাড়ি ছুঁতে গোল হ'য়ে নীচে নেমে গেছে। কোটরাগত ফুটি ফুটি চোখের তাবায় ঝিলিক মারছে কুটিল কোন মতলব। রগের শিরাগুলো দোমড়ানো মোচড়ানো। শুকনো কচি ডাবের মতো ছোট মুণ্ডুটিব পিছনে ঢুলছে একটি টিকি, ধিকিধিকি। রাত তখন কতটাই বা হবে, ঠিক আন্দাজ হয় না। টাকু মোড়ল উঠোনে এসে ডাকলো "সুখো ও সুখো, গোঙানি থামিয়ে বলবি তোর মা কোতা?" মোড়লের কথায় সুখময়ের হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। যেন সোদর বাবা প্রবাস থেকে বাড়ী এলেন! অতি কষ্টে জবাব দেয় সুখময়. "মুখুজ্জেদের বাড়ীর খ-নো দ-নো আছে, মা এঁটো কাঁটা কুড়তে যেয়েছে।" সংবাদ শুনে টাকু মোড়ল তড়িঘড়ি বলল, "তোর মাকে বলিস, আমি কাল বাড়ীতে থাকব না। কাল সাঁজবেলায় অনুকূল আসবে, একটা গোটা মাল দিতে বলবি।" সুখময় কোনো উত্তব দেয় না! যণ্ডেশ্বরীর দেখা না পেয়ে টাকু মোড়ল বিষণ্ণ মনে উঠোন ছেড়ে চলে যায়।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় অনুকূল বাগ্‌দী মোড়লের নির্দেশ মতো এক বোতল মাল নিতে এল সুখময়ের বাড়ী। অনুকূল সুখময়ের সমবয়সী। একই মাঠে চাষ কোরেছে। সামান্য বন্ধুত্বও ছিল। অনুকূলকে ডেকে সুখময় কাতরস্বরে বললো, "তোর পায়ে পড়ি অনুকূল, আমাকে একবার লাওতাড়া যাবার পথে হাসপাতালে নিয়ে চল।" পুনরায় দম নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, "আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না রে!" ফাউ হিসেবে একপাত্র মাল আগেই সাঁটিয়ে দিয়েছে অনুকূল। দিল্ তখন খুস্। সুখময়ের আকুল কান্নায় পাছে তার মৌ-তাত্ ভিজে যায়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "কুছ পরোয়া নাই সুখো, তোকে আমি যাবার পথে গাড়ীতে তুলে লোব!"

পথিমধ্যে সর্পিনীর শঙ্খলাগায় গতিরুদ্ধ মোষের গাড়ীতে ত্রিপল

চাপা সুখময় অনুকূলেব ডাকে সাড়া দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলে "অপেক্ষা কব, খানিক বাদেই ওবা চলে যাবে, আব না হয এক আঁটি খড জ্বেলে সামনে দেখা, আলো দেখলে পালাবে।" সুখোব পবামর্শে অনুকূল গজগজ কবে চোখ মুখেব ধাবা মুছতে মুছতে পযোজনীয পবিমাণ-মতো খড টেনে, সিগাবেট লাইটাব জ্বেলে আগুন জ্বালাতে প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু, ঝাপটা বাতাসে আগুনেব ফুলকি নিভে যায়। তিতিবিবক্ত অনুকূল সুখময়েব চৌদ্দপুরুষ উদ্ধাব কবে।

ওদিকে বসে বসে মনকল্প সুখময় তখন অলীক দুঃস্বপ্নেব শিকাব হয়ে নিদ্রা-তন্দ্রাব মধ্যে থেকে মাঝে মাঝেই চমকে উঠছিল। সুখময়েব মনে হচ্ছিল, সে যেন যমপুবী যাত্রা কবছে। যমবাজেব সাক্ষাৎ বাহন মোষেব পিঠে চড়ে সে এক পাতালাসিক্ত অন্ধকাব গর্তে প্রবেশ কবছে। হঠাৎ অন্ধকাবেব বুক চিবে একটা লাল হল্কা যেন সুখময়েব বুকে বিঁধল, মোষেব পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল সুখময়। ক্ষীণ অন্ধকাব আলোয় শঙ্কিত সুখময়েব চোখে ধীবে ধীবে ফুটে উঠল বড় বোড়লেব হিস হিস নাদ।

ও কী! কে!! বক্তেশ্ববীব মতো জড়িয়ে ধবে টাক মোড়ল তাব কানে কানে ফিসফিস কবে কী কথা বলছে? তবে কি সুখময়কে অপহবণ কবছে সে! কোথা থেকে একটা গোঙানীব শব্দ ভেসে এল। সুখময় দেখতে পেল, পিতা গণপতি তাঁতগাড়াতে কাছিমেব মতো, চিৎ হয়ে পড়ে জীবন যন্ত্রণায ছটফট কবছে। সবাঙ্গ ঘেমে উঠল। 'বাঁচাও' বলে সুখময মুখেব উপব চাপা ত্রিপল সবিয়ে ফেলে আপ্রাণ চেষ্টা কবতে লাগলো।

ও দিকে, অনুকূল কোনো প্রকাবে এক আঁটি খড জ্বেলে গাড়ীব ছোযালেব উপব দাঁড়িয়ে সর্পিনীব শৃঙ্গমোচনেব তাগিদেই মুখে হেট্-হেট্ শব্দ কবছে। খড়েব আলোয জীর্ণ ওভাবকোট পবিহিত অনুকূলেব দৈত্যাকৃতি ছাযা শস্যেব উপবে কালো ঝোড়ো হাওযায নেচে নেচে উঠছিল। অনুকূলেব তিবস্কাবে, না তাব ছাযানৃত্যে ভীত হ'য়ে শঙ্খিনী যোগ ত্যাগ কবে ধানক্ষেতে অদৃশ্য হ'ল, তা বলা শক্ত। মোষেব গাড়ী পুনবায় চলতে লাগলো।

হীরাপুরের পশ্চিম প্রান্তে রেলের ডিস্ট্যান্ট সিগ্ন্যাল পেরিয়ে, স্বাধীন ভারতের সমাজ পরিত্যক্ত হরিজনের মত মুখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে থানা-হাসপাতাল। পা-তিনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলেই টালিছাওয়া পাকা বারান্দা। ওখানে সুখময়কে শুইয়ে রেখে কখন যে অনুকূল লাওতাডা চলে গেছে কেউ জানে না। সুখময়ের অসুস্থ শীতার্ত আত্মাটি ঘুণপোকার মত দেহের জীর্ণ কোষ ফুঁড়ে ফুঁড়ে নূতন কোষাশ্রয়ের সন্ধানে রত। মৃতদেহবাহী ডোমের টিনের ঠেলাগাড়ীটি বারান্দায় উঠতেই ডানপাশে নামানো আছে।

মেঘে ঢাকা অন্ধকার রাত। বৃষ্টি থেমেছে। ভিজে বাতাসে হাসনুহানার মদির গন্ধ। এমন সময়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলতে বলতে দুই যুবক—কতইবা বয়স হবে—এসে হাসপাতালের বারান্দায় উপস্থিত হ'ল। একজন চাপা গলায় তার সঙ্গীটিকে সেস্থানে অপেক্ষা করতে বলে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হ'ল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপর যুবকটি ডান হাতের চাটু দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বাঁ-কাঁধটি চেপে ধরে আছে। সামনে তাকাতেই সে দেখলে পেল, শতছিন্ন ভিজে বস্তা চাপা মৃতবৎ একটি দেহ বারান্দায় পড়ে আছে। যুবকটির যন্ত্রণায় চোখের কোণে চকিতে ব্যথিত বিস্ময় জেগে ওঠে।

যুবকের বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলের বাঁধন ছাপিয়ে, বাঁ-কাঁধের গভীর ক্ষত থেকে তরতাজা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। তৎসত্ত্বেও সে দৃঢ়ভাবে মৃতকল্প সুখময়ের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো। গুঁড়ি হয়ে সুখময়ের মুখের ওপর কান পেতে ক্ষীণ নিঃশ্বাস-প্রবাহের আভাস পেয়ে বুঝল যে, শেষ নিঃশ্বাস অসাড় জড়বৎ দেহটিকে অসীম মমতায় এখনো ত্যাগ করে যায় নি। অজ্ঞাতকুলশীল জড়বৎ দেহটিকে সম্বোধন করে আহত যুবকটি ডাকল, "কমরেড্!" সুখময় শুনলো কি শুনলো না, আহ্বানের কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হ'ল না।

এমত সময় পরনে লুঙ্গি, গেঞ্জি গায়ে, গলায় ষ্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে, হ্যারিকেন হাতে ডাক্তারবাবু হাসপাতালের বারান্দায় এসে একজন আহত ও অপর একজন অর্ধমৃত রুগীকে দেখে বিস্ময়সূচক দৃষ্টিতে

তাঁর সঙ্গী যুবকটির দিকে তাকালেন। ডাক্তারবাবুর বিস্ময় লক্ষ্য করে সুস্থ যুবকটি তার আহত বন্ধুর দিকে চেয়ে জানতে চাইল, "ও কে?" বন্ধুর সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে আহত যুবকটি বলল, "ও এখনো বেঁচে আছে ডাক্তারবাবু। সবার আগে ওর ভিজে বস্তাটা সরিয়ে ওকে একটা গরম কম্বলে ঢাকা দিন। তারপর আমার দিকে নজর দেবেন।" বন্ধুর সহায়তায় ডাক্তারবাবু হাসপাতালের ভিতরের ঘরের বেডে সুখময়কে শুইয়ে দিয়ে একখানা লাল কম্বলে ঢেকে দিলেন। সুখময়ের জীবাত্মা এই প্রথম গরম কম্বলের উষ্ণতার স্পর্শ পেল। আহত যুবকটির কাঁধ থেকে বেরুলো একটি ভোঁতা বুলেট। ডাক্তারবাবুর বাঁকানো ছুঁচ যখন চামড়া ফুঁড়ে বেরুচ্ছিল, তখন ও হাসতে হাসতে তেলেগু ভাষায় গাইছিল—

"কাত্তু লুত্বস্কু পোরিনা, নেত্তুরুটেরুলুপারিনা.

এত্তিনাতু পাকী দিঞ্চে দিলেত্বু।"

(তরবারির আঘাত যতই লাগুক, খুনের নদী যতই বহুক, উঁচিয়ে ধরা বন্দুক কিছুতেই নামাবো না।)

বাঁধাছাঁদা হ'লে ডাক্তারবাবু অতঃপর তাঁর আর কি করণীয় আছে, তা জানবার জন্য যুবকদ্বয়ের দিকে নীরবে হ্যারিকেন তুলে দৃষ্টিপাত করলেন। গভীর কৃতজ্ঞতাবোধে আহত যুবকটির কণ্ঠস্বর বড় ধীর, বড় শান্ত। "ডাক্তারবাবু", আহত যুবকটি বলল, "আজ পরম আনন্দের রাত। শ্রেণী-শত্রুর রক্তে হাত রাঙিয়েছি! আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করলুম নরম্যান বেথুনকে। (সুখময়ের শয্যার দিকে ইঙ্গিত করে) কমরেড রইল। অবস্থা ভাল নয়। সম্ভব হলে আজ রাতের মধ্যেই বা কাল খুব সকালে সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেবেন।" ডাক্তারবাবু নিশব্দে তার অনুরোধ অনুমোদন করলেন। বিপ্লবী যুবকেরা অপসৃয়মান অন্ধকারে আত্মগোপন করল।

সিঁড়ি হ'তে নামতেই হাসনুহানার গন্ধে আক্রান্ত হ'য়ে থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু। বুক ভ'রে টেনে নিলেন হাসনুহানার ভরাট মিষ্টি গন্ধ। হ্যারিকেনের সল্‌তে উস্‌কে সদর হাসপাতালের সঙ্গে

যোগাযোগ করতে অগ্রসর হলেন ডাক্তারবাবু। জীবন্ত বিপ্লবী স্বচক্ষে দেখেও ডাক্তারবাবুর মনের ভয় কাটে না। এত সাহস, মানুষের প্রতি এত ভালোবাসা ওদের, তবু কেন সবাই তারস্বরে চীৎকার করে ভয় দেখাচ্ছে—'ওরা উগ্রপন্থী, ওরা অসামাজিক?' ডাক্তারবাবুর তো ওদের দেখে মনে হ'ল কানাইলাল, বাঘা যতীনেরা যেন কোন এক অসীম মন্ত্রবলে জীবন্ত হ'য়ে ধরা দিয়েছে ওদের মধ্যে। কোয়ার্টার্সের দিকে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু। হ্যারিকেনের আলো মিলিয়ে যেতেই নিশিভোরের অন্ধকারে ভাসতে লাগল হাসানুহানার গন্ধ।

সদর মহকুমা শহরের পশ্চিম প্রান্তে কলতলার পাথরে ডাঙায় সদর হাসপাতাল সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে, হাই তুলে আলস্য ত্যাগ করছে। ডাক্তারদের কোয়ার্টার্স থেকে গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে, আলুথালু বেশে নিশি-জাগরণক্লিষ্ট রক্তচক্ষু মর্দন করতে করতে ডাঃ কুমার হাসপাতালের দরজা ঠেলে সুখময়ের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন ক'রে রুদ্ধ আগ্রহে রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সুখময়ের নিমীলিত নেত্র লোম বাতাসে কাঁপছে। নাকের সুড়ঙ্গ বেয়ে একজোড়া উদজানবাহী নল ভিতরে প্রবেশ ক'রে সুখময়ের হৃদপিণ্ডের লোডশেডিং কোনক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছে। ভোর রাতে হীরাপুর অ্যাম্বুলেন্সযোগে বাহিত মরণাপন্ন রোগী সুখময়কে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল ডাঃ কুমারের উপর। রোগীর নাম জানতে চাইলে হীরাপুরের ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে টেলিফোনযোগে জানায় যে, রোগীর নাম —'কমরেড'। অচৈতন্য সুখময়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডাক্তার কুমারের মনের আনাচে কানাচে নূতন রোগীকে ঘিরে চেরাপুঞ্জির মেঘের মত শত কৌতূহল পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে।

পূবে মহুয়া বনের সবুজপাতার আড়াল ভেদ ক'রে, সকালবেলার নরম আলো বনের লাল মাটিতে আছড়ে পড়ছে। একটি স্ফূর্তিবাজ বুনো মোরগ লাল ঝুঁটি নাড়িয়ে ডেকে উঠল। ডাক্তার কুমারের মুখে হাসি ফুটিয়ে চোখ মেলল সুখময়। ডাঃ কুমার নীরব ইঙ্গিতে সুখময়কে আশ্বস্ত ক'রে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে উঠে পড়লেন।

ডাক্তার কুমার প্রাতঃস্নানে রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি অবনোদন ক'রে রাত-জাগা বিছানায় সবেমাত্র গা এলিয়ে দিয়েছেন। এমন সময়ে সশব্দে একটি জীপ-গাড়ী ভিড়ল ডাক্তারবাবুর দরজায়। ডাঃ কুমার ঢিলে পাঞ্জাবী দেহে গলিয়ে দরজা খুলতেই দেখলেন, জীপ গাড়ী থেকে পুলিশসাহেব নামছেন।

পরম কৌতূহলে ডাক্তারবাবুর চোখ জোড়া, কান খাড়া ক'রে তাকিয়ে রইল। পুলিশ সাহেব গাড়ী থেকে নেমে সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন, "ডাক্তার কুমার, গত রাত্রিশেষে যে রোগীটিকে আপনি ভর্তি করেছেন সে নকশাল দলভুক্ত। হীরাপুরের অঞ্চলপ্রধান অন্নদা চাল-কলের মালিক প্রাক্তন কংগ্রেস এম. এল এ কালিদাস হাটিকে খতম ক'রে তারা হীরাপুরের হাসপাতালে যায়। ওখানে একজন গুলি বের করিয়ে নেয়। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার আগে, তাদের এক কমরেডকে সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য ডাক্তারবাবুকে কড়া নির্দেশ দিয়ে যায়।"

পুলিশ সুপারের কথাগুলি শুনতে শুনতে ডাক্তার কুমারের মনে একটি সংকল্প সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে সতর্ক হ'য়ে উঠল। যেমন ক'রে হোক অসুস্থ কমরেডকে এই ক্ষুধার্ত নেকড়েদের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে সদলবলে ডাক্তার কুমার গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে সুখময়ের শয্যার পাশে উপস্থিত হলেন। শিশিরে ভেজা টাটকা আলোর দিকে সুখময় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল। ডান হাতে কালো ব্যাটন, বাঁ-হাত কোমরে রেখে, সুখময়ের মুখের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ালেন পুলিশ সুপার। ঘামে-ভেজা ঝাঁঝালো নিঃশ্বাস ক্লোরোফর্মের কাজ করল। সুখময়ের চোখ আপনাআপনি বুজে গেল। ডাক্তার কুমার তা লক্ষ্য ক'রে বললেন যে, রোগীর অবস্থা খুব সংকটজনক। সামান্য সুস্থ হ'লে আপনারা আসবেন।

নাক খেঁদা, তবলা-মুখো পুলিশ সাহেবের ঘোলাটে ড্যাব্‌ড্যাবে চোখের দিকে তাকিয়ে সুখময়ের তোবড়ানো পাঁজরার মাঝে শায়িত হৃদপিণ্ডটি খাবি খেতে লাগল। মদের ঝাঁঝাল গন্ধে সুখময়ের গা পাক

দিয়ে উঠল। বমি বমি ক'রে উঠল। সারাদেহ কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠল।

রোগীর প্রতি ডাক্তার কুমারের পক্ষপাতিত্ব পুলিশসাহেবের নজর এড়ালো না। মৃদু কেশে গলাটা চেখে নিয়ে পুলিশসাহেব ডাক্তার কুমারকে বললেন, "দেখছেন মশাই! পুলিশ দেখে কেমন কান-কোটারির মত গুটিয়ে শুয়ে পড়ল। এ রোগ সারানো আপনার কম্ম নয় ডাক্তারবাবু। এ রোগ সারানোর দাওয়াই আমার জানা।" কথাগুলি বলতে পুলিশসাহেব কোন এক নকশালী আক্রমণে সম্মুখের হৃত দন্তত্রয় স্থানে অভিষিক্ত, বাঁধানো দাঁতের গোলাপী সেট্ জিব দিয়ে একবার সামনে ঠেলে, আবার যথাস্থানে বসিয়ে নিলেন। চোখ-জোড়া কপালে তুলে হেঁড়ে গলায় শূন্যবাদী দার্শনিকের মত বললেন পুলিশসাহেব, "আপনারা চিকিৎসা করেন ব্যক্তির দেহের কখনো-সখনো মনেরও ; আমরা চিকিৎসা করি সমাজদেহের। সেখানে আগুন লাগলে আপনি বাঁচাবেন কাকে!" কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থাকলেন পুলিশ সাহেব। কণ্ঠে ফুটে উঠল ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার সুর। সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, ঈষৎ ডান দিকে ঘাড় এলিয়ে বলতে থাকলেন পুলিশ-সাহেব, "একবার ভেবে দেখুন তো ডাক্তারবাবু, চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করতে আপনার পিতৃদেবকে আপনার পিছনে কত নগদ মূলধন নিয়োগ করতে হয়েছে? আমাদের দেশে ছেলেপড়ানোও তো ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখার সামিল। ব্যাঙ্ক সুদ দেয়, ছেলের কাছেও বাবা সুদ আশা করে। হুঁঃ! সরকার মাসে মাসে যা পারিশ্রমিক দেয়, তাতে আপনার মান-ইজ্জত সাধ-আহ্লাদ মেটে। হাসপাতালের ডাক্তার হ'য়েও আপনারা প্রাইভেটে প্রাকটিস্ করেন। আমরা জানি, সমর্থন করি, সরকারও করে। কোথাকার কে কল্কি অবতার উড়ে এসে জুড়ে বসে বলছে, ডাক্তারবাবু ফিস্ কমান, গরীবের চিকিৎসা করুন বিনা পয়সায়। আর আমাদিকে বলছে, 'এই পুলিশ, তুই বড়লোকদের কুত্তা। আমাদের কাজে বাধা দিলেই তোর মাথা থেঁথলে দোব। মহাজন, জোতদার, ডাক্তার, সুদখোর অর্থাৎ সমাজের মাথা মাথা

লোকদের কাটা মুণ্ড রাস্তায় গড়াগড়ি যাবে, পুলিশ তুমি নাক গলাবে না। গরীবের রাজত্ব কায়েম করবেন ওনারা! আরে মশায়, গরীব চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। আর না থাকলে, কাঁঠাল ভাঙব কার মাথায়?" সামান্য বিরতির পর পুলিশসাহেব ফের বলতে শুরু করলেন। ডাক্তারবাবুর মগজ ধোলাই হয়তো এখনো অসম্পূর্ণ। "খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, লুটপাট, দাঙ্গা-মারামারি, এসব তো সব দেশেই আছে, সবসময়ই থাকে। আর থাকে বলেই তো আমাদের বাড়বাড়ন্ত। পুলিশ আছে, আবার শান্তি-শৃঙ্খলাও আছে, এমন কোন দেশ আছে নাকি! তবে কি জানেন, এ শূয়োরের বাচ্চারা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে।" ডাক্তার কুমার লক্ষ্য করলেন, পুলিশ সুপার ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন,—সকালবেলায় ঘেমে উঠেছেন, মুখমণ্ডল দ্রুত কালো হ'য়ে আসছে। পুলিশ-সুপারের কণ্ঠস্বর আরও উচ্চগ্রামে উঠল, "শালারা দেশটাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিল! সাহস কত ব্যাটাদের! প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে, জোতদার, মহাজন, পলিশের গলাকাটা চলছে, চলবে! বিপ্লব করবে! বড়লোকের চামড়ায় গরীবের জুতোর সুখতলা তৈরী হবে! কথায় কথায় 'মাও সে তুঙ'! শালাদের তুং-তাং বুজরুকি ঠাণ্ডা ক'রে দেব!" --কথাগুলি বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠলেন পুলিশসাহেব। ঘেমে উঠলেন ভর সকাল-বেলায়! থপ্‌ ক'রে বসে পড়লেন হাসপাতালের মেঝেতে।

হতচকিত সশস্ত্র কনস্টেবলটি রাইফেল কাঁধে তুলে এ্যাটেনশন্‌ হ'য়ে দাঁড়াল। ডাক্তার কুমার চকিতে অবস্থা অনুমান ক'রে দ্রুত ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র এনে পুলিশ সাহেবের রক্তের চাপ মেপে দেখলেন, পারদ বিপদ-সীমা অতিক্রম করেছে। কনস্টেবলের সহায়তায় শয্যার ঠিক পাশের বেডেই পুলিশ সুপার স্থানলাভ করলেন। ডাক্তার কুমার কয়েকটি এলডোমেট্‌ ট্যাবলেটের সঙ্গে কয়েকটি প্যাক্‌সাম ট্যাবলেট গলাধঃকরণ করিয়ে পুলিশ সুপারকে পাহারা দিতে বলে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে হাসতে পুনরায় বিশ্রামের উদ্দেশ্যে নিজ কোয়ার্টার্সের দিকে অগ্রসর হলেন।

এতক্ষণ সুখময় চোখ বুজে শুয়েছিল আর ভাবছিল! সুখময় সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়াকালীন দু'একটি শব্দ স্মরণ করতে পারলেও তার সঙ্গে বর্তমান পুলিশী অভিযানের কোন কারণ-সংকেত খুঁজে পেল না! হাসপাতালে ভর্তি হয়ে অজান্তে সে কোন্ অপরাধ ক'রে বসেছে, বুঝে উঠতে পারল না। তার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে পুলিশ আগমনের সম্পর্ক কী?

ধীরে চোখ মেলে সুখময় দেখে, টুলের উপর বসে একটি পুলিশ ঢুলছে, সেই সঙ্গে তার কোমরে চেন দিয়ে বাঁধা বন্দুকটি মাঝে মাঝে টাল্ খাচ্ছে, বেজে উঠছে ঝম্ ঝম্। রামখাটীর গোমস্তা ইয়াকুব শেখের বাড়ীর ধলা কুকুরটার কথা মনে পড়ল! কুকুরটি সদর দরজার পাশে বসে মাঝে মাঝে হাই তুলত, সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠত ওর গলার চেন।

পার্শ্ববর্তী শয্যার দিকে নজর ফেরাতেই সুখময় চমকে উঠ। হাত-পা ছড়িয়ে নাক ডাকাচ্ছে সাক্ষাৎ যমদূত পুলিশসাহেব। সাহেবের পেটটি পাশ-বালিশের মত একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। তা দেখে সুখময়ের হাসি পেল। পেট-ঝোলা আমেরিকান কই মাছের কথা মনে পড়ল! মনে মনে ভাবল, যমদূতের ঐ পেটে নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ শয়তানের ডিম কিলবিল করছে। শিউরে উঠল সুখময়। পরমুহূর্তে পুলিশসাহেবের বিচিত্র নাসিকা গর্জনে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হেসে উঠল।

হাসি শুনে প্রহরারত পুলিশটি লাল চোখ বের ক'রে সুখময়কে জিজ্ঞাসা করল, "এই শালা হাসছিস্?" ওর হাব-ভাব আর কথার ধরন-ধারণ দেখে সুখময় হাসি চাপতে পারল না! বলল, "ক্ষিধে লেগেছে, তোমার পায় নাই?" ক্ষিধের কথা উঠতেই কনস্টেবলটির মুখ কেমন যেন একটু করুণ দেখাল। আশেপাশে একটু তাকিয়ে চেনে বাঁধা বন্দুকটি ঘাড়ে ফেলে ডাক্তার কুমারের ঘরের কড়া বাজাতে উঠল।

ডাক্তার কুমার যেন ডাকের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ধরাচূড়া না ছেড়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে ভাবছিলেন ক্ষয়গ্রস্ত মেরুদণ্ড

অনাহার অনিদ্রায় শীর্ণ রোগীটির সঙ্গে নকশালদের যোগসূত্রটি কোথায়? ক্রমে, তাঁর ভাবনার দিকচক্রবালে ধীরে ধীরে একটি সোনালী রেখা জেগে উঠল। সর্বহারাদের সার্বিক আরোগ্যই তো তাদের ঘোষিত লক্ষ্য!

অল্পদিন হল শিলিগুড়ি থেকে এ-জেলার সদর হাসপাতালে বদলি হ'য়ে এসেছেন। শিলিগুড়িতে বসেই শুনেছিলেন, 'আর-জি-কর' মেডিকেল কলেজের তাদের সময়কার ছাত্রনেতা বিমল, সুহাস—ওরা নাকি এ জেলায় নকশাল আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে পূর্ব থেকে আত্ম-গোপন ক'রে আছে। গতরাত্রে কে গুলিবিদ্ধ হ'ল! বিমলদা নয় তো?

হোস্টেলের খাওয়া-দাওয়া সেরে কমন্‌রুমের মেঝেতে ঢালোয়া সতরঞ্চি পেতে ওরা তাস খেলছে! রাত কত হ'ল, কারো কোন খেয়াল নেই। এমন সময় বিমলদা ফিরল। উস্‌কো-খুস্‌কো চুল। প্রশস্ত বিদ্যাসাগরী কপাল, গালে তো পক্ষকাল খুর পড়েনি। চোখ-জোড়া অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতায় উজ্জ্বল, 'ও-চোখের দিকে চাইলে ঘুমেরও মাথা ঘুরে যায়। আড়চোখে শুধু একবার চাইত বিমলদা। ওদের হাতের সাহেব বিবি-গোলাম চুপচাপ বোবা ব'নে যেত। মৃগাঙ্কটা ছিল বড় ফাজিল। বিমলদা চলে যেতেই বলত, 'ওরে বাবা, কমরেড বিমলদার কাছাকাছি কেউ যেও না; স্রেফ পুড়ে যাবে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব গা থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে।' সমর, গনেশ ওর কথা শুনে হাসতে গিয়েও পারল না. কুমারের মনে অজানা অপরাধ এসে বাসা বাঁধত। বিমলদার কথাগুলো ওর কানে বাজে, "কুমার, আমাদের দেশটাই তো এক বিরাট হাসপাতাল। হাসপাতালের রোগীরা যেমন বিছানায় শুয়ে ছট্‌পট্‌ করে। একবার বাঁ-কাত হ'য়ে শোয়। ভাবে আরাম পাবে। আবার ভাবে, ডান-কাতেই ভাল ছিল। বাম-ডান সবই সেই শাঁখারীর করাত।"

দরজার কড়াটা পুনরায় খুব জোর ন'ড়ে উঠল। ডাক্তার কুমার ভাবনা থামিয়ে স্টেথো গলায় বাইরে বেরিয়ে এসে কনস্টেবলটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর?" কমস্টেবল বলল, "বড় সাহেবের

নাক-ডাকানি শুনে অসামীর বড় ক্ষিধে পেয়েছে।" ডাক্তার কুমার কনস্টেবলটির বাচনভঙ্গি দেখে হেসে উঠলেন।

ডাক্তার কুমার ওয়ার্ডে প্রবেশ করলেন। কৃতজ্ঞতার মধুর হাসিতে ভরা সুখময়ের চক্ষুদ্বয় ডাক্তারকে আমন্ত্রণ জানাল। নিশি-জাগরণে ক্লান্ত ডাক্তার বাবুর শ্রম হাসি হ'য়ে ফুটে উঠেছে সুখময়ের চোখে।

আনন্দে ছেদ পড়ল—পুলিশ সাহেবের সাড়ম্বর নাক-ডাকানিতে। ডাক্তার কুমারের মেজাজটা বিগড়ে গেল মুহূর্তে। ঘুমন্ত জলহস্তীসদৃশ শায়িত বস্তুটির দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু চাপাগলায় স্বগতোক্তি করলেন—'ক্যাডাভেরাস'। ডাক্তারবাবুর মুখে এই অশ্রুতপূর্ব শব্দটি শুনে কনস্টেবলটি মনে মনে ভাবল, তাদের বড় সাহেব ক্যাডাভেরাস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

সুখময়ের প্রাতঃরাশের কথা সিস্টারকে মনে করিয়ে দিয়ে সহাস্যে কনস্টেবলকে ডাক্তারবাবু বললেন, "হাসপাতালে পুলিশের জলখাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। আপনি বাইরে গিয়ে ওটা সেরে নিতে পারেন।" ডাক্তারবাবুর দিকে একবার অসহায় দৃষ্টি-নিক্ষেপ ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে ওয়ার্ড থেকে নির্গত হলেন কনস্টেবলটি। বন্দুকের সঙ্গে বাঁধা কোমরের লোহার চেন হাসপাতালের মেঝে ঘষটে ঝুম্‌ঝুম্‌ আওয়াজ তুলছিল।

ধীরে ধীরে কুমার নিদ্রিত পুলিশসাহেবের কাছে গিয়ে, সাহেবের হাত ধরতেই, উনি বোয়াল মাছের মত এক মুখ হাই ছেড়ে ডাক্তার-বাবুর মুখের দিকে মধুর হেসে তাকালেন। ডাক্তার কুমার সহাস্যে বললেন, "কি, ভাল ঘুম হয়েছে তো? প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, বাড়ী যান। খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিশ্রাম নিন, প্রয়োজন হ'লে ওবেলায় আসবেন।" ডাক্তারবাবুর প্রস্তাবে মৌন সম্মতি জানিয়ে, ধড়াচূড়ো ঠিকঠাক ক'রে হাসপাতাল ছেড়ে সুখময়ের দিকে একবার পুলিশ সাহেব চাইলেন—বলিবদ্ধ ছাগকে এককোপে কাটতে না পারলে ঘাতকের মনের ভাব যেরূপ হয়, ঠিক তেমনিভাবে, অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসার ঝাঁঝ ফুটে উঠল তাঁর চোখে। প্রাক্‌-প্রস্থান মুহূর্তে

মনে মনে বললেন, 'দাঁড়া শালা শুয়োরের বাচ্চা। এ বেলাটা যাক। ওবেলায় তোকে ভেল্কী নাচন দেখাবো!'

পূর্বদিকে মাথা ক'রে সুখময় দ্বিপ্রাহরিক যন্ত্রণাময় তন্দ্রার মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় দূরের ঘন সবুজ শালবনের মাথায় লাল টুকটুকে সূর্য হামাগুড়ি দিয়ে হাসছে। সে লাল হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়েছে সুখময়ের ওপর।

আলোর অঞ্জলিস্পর্শে ধীরে ধীরে চোখ মেলে সুখময়। দু'হাত পিছনে ভর দিয়ে বিছানার ওপর বসে। দেখতে পায় জলেভেজা শিরশিরে হাওয়ায় গা দুলিয়ে নাচছে কৃষ্ণচূড়ার স্তবক—গোধূলির আবির মেখে সারা অঙ্গে। অকারণ পুলকে বহুদিনের ঝিমিয়ে পড়া মন সাড়া দেয়। বেঁচে থাকার এমন আনন্দময় আকুলতা সুখময় কোনদিন অনুভব করেনি। কতকাল যে অপরূপ দৃশ্যপটে সুখময়ের নয়ন যুগল আচ্ছন্ন ছিল, তা সে মনে করতে পারে না। ধ্যান ভাঙল পশ্চাতে কয়েক জোড়া বুট জুতোর সদম্ভ আবির্ভাবে। মুহূর্তে সুখময়ের চোখে আঁধার ঘনাল। দ্রুত মুখে কম্বল ঢাকা দিয়ে, সাক্ষাৎ জহ্লাদের মুখ দর্শন থেকে নিজেকে বিরত রাখল।

চোরা না শোনে ধরম-কাহিনী। দ্বি-প্রাহরিক আহার ও বিশ্রামে পরিতৃপ্ত পুলিশ সাহেব সুখময়ের মুখাবরণ কালো ব্যাটনের ডগার খোঁচাতে তুলে ফেললেন। খোঁচাটা ইচ্ছাকৃতভাবে জোরালো হয়ে থাকবে। ভয়ে ভরা দু'চোখ মেলে চাইল সুখময়।

ডাক্তার কুমার তাড়াতাড়ি সুখময়ের পিঠের কাছে বালিশ রেখে, সুখময়কে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করলেন। আনুষ্ঠানিক কণ্ঠে পুলিশ সাহেব ডাক্তার কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার কুমার, রোগীর এ্যাডমিশন-স্লিপটা দেখি।" ডাক্তারবাবু সুখময়ের রোগ-শয্যার ভিতর থেকে এক টুকরো হলুদ কাগজ পুলিশ সাহেবের হাতে দিলেন। বুক পকেট থেকে চশমা বের ক'রে, চশমা পরে, স্লিপের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ডাক্তার কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন পুলিশ সাহেব, "রোগীর নাম কমরেড লিখেছেন কেন?"

ডাক্তার কুমার উত্তর দিলেন, "হীরাপুর থানা হাসপাতালের ডাক্তার ঘোষ আমাকে ঐ নামেই ভর্তি করার জন্য রাত তিনটের সময় এ্যাম্বুলেন্স সহযোগে রোগীকে পাঠান। আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম। রোগী দেখে, যা সত্য, তা লিখে রেখেছি।" ডাক্তারবাবুর জবানবন্দী শুনতে শুনতে পুলিশ সাহেব সুখময়ের মুখের দিকে চাইলেন।

সাহেবের চোখ-জোড়া কাঁচা সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে ঝলসে উঠল। তা দেখে সুখময়ের নিম্নাঙ্গে এক শীতল-প্রবাহ ব'য়ে গেল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে এসব কী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চলছে, চুরি-দারি খুন-খারাবি চোখেও দেখে নি সুখময়, তবে বার বার পুলিশ কেন? এক অবসন্ন বিস্ময়ে সুখময় মুখ তুলে তাকাল ডাক্তার কুমারের দিকে।

ডাক্তার কুমার রোগীর মানসিক অসহায়তা হৃদয়ঙ্গম ক'রে তার মনে সাহস জোগাবার জন্য বললেন, 'কমরেড, পুলিশ সাহেব যা প্রশ্ন করেছেন, সেগুলির উত্তর দাও, কোন ভয় নেই।'—এই অপ্রীতিকর অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির অচিরাৎ সমাপ্তি কামনায় ডাক্তার কুমার সুখময়ের মুখের দিকে চাইলেন। পুলিশ সাহেব খাটের উপর বাঁ-ঠ্যাং তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে কমরেড, আর সব দলবল কোথা?' সুখময়ের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ে, ডাক্তার-পুলিশ সকলেই সুখময়কে 'কমরেড' বলে ডাকছে কেন? সুখময়ের নীরবতায় পুলিশ সাহেবের মেজাজ বাড়ে। চড়াগলায় বললেন, 'চুপ ক'রে আছিস্ কেন? জবাব দে, তোর নাম কি? বাড়ী কোথা? কারা তোকে হাসপাতালে ভর্তি করল? তারা দেখতে কেমন? কার গুলি লেগেছিল, সে কোথা গেল?'

প্রশ্নে অস্থির সুখময়ের কানে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকতে লাগল। কানে আঙুল গলিয়ে, কানের কানতালা ছাড়াতে ছাড়াতে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আমার নাম শ্রীসুখময় সাহা। বাড়ী নয়নবাঁধ। টাকু মোড়লের মাহিন্দার অনুকূল বাগ্‌দী আমাকে হয়তো হীরাপুরের হাসপাতালে রেখে থাকবে, আর কিছুই আমার মনে নেই।' কথাগুলি কোনক্রমে শেষ ক'রে পুনরায় চোখ বুজে শুয়ে পড়ল সুখময়।

সুখময় চোখ বুজতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে পুলিশ সুপার বললেন, 'চোখ বুজলে তো হবে না বাছাধন। বলতে হবে, অনুকূল যদি তোকে নামিয়ে দিয়ে যায় তবে হীরাপুরের হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলছে কেন—দু'জন নকশাল পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তোকে ভর্তি করেছে, জোর ক'রে কাঁধের গুলি বের করিয়ে নিয়েছে? বল্ শালা, তারা কে? কোথা থাকে?'—প্রশ্নের হুমকিতে কাহিল হ'য়ে পড়ল সুখময়।

এক দৈব-দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে সে! পাঁজরেব হাড় দু'খানা সোজা করতে এসে, এত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হ'তে হবে, আগে জানলে সুখময় কখনো অনুকূলকে অনুরোধ কবত না তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যে।

পুলিশ সাহেবের রাগে রাঙা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুখময়ের দেহ কেঁপে উঠল। বলিবদ্ধ ছাগশিশু যেমন ভয়ে থরহরি কাঁপতে কাঁপতে কুণ্ডলী পাকিয়ে যূপকাষ্ঠে নিজেকে সমর্পণ ক'রে খাঁড়ার ঘায়ের অপেক্ষায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, সুখময়ও তেমনি চোখ-মুখ বিছানায় গুঁজে পড়ে রইল।

ডাক্তার কুমার তাড়াতাড়ি রোগীর কাছে গিয়ে সুখময়ের দেহটি কম্বলে ঢেকে দিয়ে পুনরায় পরেরদিন আসবার জন্য অনুরোধ করলেন; অসহিষ্ণু পুলিশ সাহেবের গজ্‌গজানিতে তিক্ত হতাশা ঝ'রে পড়ছিল। নিজেব মনে বিড়বিড় করতে করতে এগোলেন পুলিশ সাহেব। পুলিশ সুপারের পায়ে পায়ে ডাক্তার বাবুও অগ্রসর হ'লেন। পুলিশ সাহেবের খেদোক্তি তাঁর কানে এল। —পুলিশ তো নয়, যেন মাম্‌দো ভূতের সম্বন্ধী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করব! না-গেরিলা যুদ্ধ করব! কতবার বললাম, বন্দুকগুলো থানায় জমা দিয়ে যা, ব্যাটারা কথা শুনল না! এবার সন্দুকে মর্। তুই ব্যাটা এখন ছোট্ট, কোথায় কোন্ জোতদারের মাথা কাটা হ'ল, কোথায় কোন্ সুদখোরের মুণ্ডু খসে পড়ল, কে কোন্ হাসপাতালে ভর্তি হ'ল। গোটা জেলাময় খুন-খারাবি।

হঠাৎ ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'ক'জন পুলিশ মরেছে, জানেন মশায়! পুলিশদের এখন নকশালদের নাম করলে পোঁদ টিপ্‌টিপ্‌ করে! আর হয়েছে শালা চীন রেডিও, কেবলই বলে এ জেলা মুক্ত, নকশালদের দখলে। একটু কান ক'রে শুনবেন, আজকাল আবার প্রায় সবাই গোপনে গোপনে পিকিং সেন্টার খুলে বসে থাকে! এমন কি বললে বিশ্বাস করবেন না আমার মিসেস নির্দিষ্ট সময়ে, চুপিসাড়ে চীনা রেডিও শোনে। ওঁর আশঙ্কা, এই বুঝি মুক্তি-ফৌজ এসে শহর দখল ক'রে বসল! কি গুজববাজ্‌ লোক এদেশে মশায়! যত বলি, গুজবে কান দিও না, গুজব ছড়িও না। তত বেশী গুজবের নেশা ধরে ওদের!' একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল পুলিশ সুপারের। ডাক্তার মন দিয়ে পুলিশ সাহেবের খেদোক্তি শুনছেন। পুলিশ সাহেবের গলার স্বর খাদে নেমে এল।

তারপর ডাক্তার কুমারের দিকে এক-পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কতবার রাইটার্সে খোদ মন্ত্রীকে জানিয়েছি—জেলার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ভেঙে পড়েছে। পুলিশের মরাল ব্রেক-ডাউন করেছে। মিলিটারী, প্যারা-মিলিটারী কিছু একটা পাঠাও, কা-কস্য পরিবেদনা। মর্‌ শালা তোরা এখন অটালে! আজ চলি, আবার আসব।' বলেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সদলবলে পুলিশ সাহেব বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার কুমারও সেই সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

হাসপাতালের দু'বেলা পথ্য ও উষ্ণ কম্বলের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ ক'রে সুখময়ের দেহে কিঞ্চিৎ প্রাণ সঞ্চারিত হ'তে না হ'তেই অতর্কিত পুলিশী অভিযানে তটস্থ হ'য়ে ভেবে ম'লো। জেলাময় এমন লঙ্কাকাণ্ড চলছে, তার কোন খবরই তার কানে আসে নি, আসা সম্ভবও নয়। হাটী-হত্যার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, কোন সমাধান খুঁজে পায় না সুখময়। গেরস্থদের মুখে দু'একদিন শুনেছিল, গোটা থানার সোনা-দানা, পেতল কাঁসা সব ওর বাড়ীতে বন্ধকে আছে। আণ্ডিল টাকা সুদে খাটে। অঢেল জোত-জমা। তেল, সিমেণ্ট,

সারের বড় কারবারী। সুখময় জীবনেও তার মুখ দেখে নি। সেই অদেখা হাটীর মাথা কাটল কোন রণবীর!

নকশাল শব্দটি সুখময় যেন একবার শুনেছিল, কোলকাতার রঘু ডাকাতের কালীর পুজোরী কোমল ঠাকুরের মুখে।

ঘোষেদের বারবাড়ীর উঠোনে বকুলগাছের তলায় গাঁ-এর পাঁচজন ব'সে; ঠাকুরমশাই বসেছেন গরুর গাড়ীর ওপরে। ঠাকুরমশায়ের আস্তে কথা হয় না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন, 'তোরা থাকিস্ গাঁয়ে, যা, একবার কলকাতা যা, দেখবি দেওয়ালে তিল ধারণের জায়গা নেই, লাল সেলামে ভ'রে গেছে। নকশাল বাড়ী লাল সেলাম। কি যেন ভদ্রলোকের নাম, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শ্রীকাকুলাম লাল সেলাম'। ঠাকুরমশায়ের বক্তৃতার অন্যতম শ্রোতা গণেশ হাজরা জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, 'সি আবার কি জাত গো?' —উত্তরে ঠাকুরমশায় বললেন, 'বাবা, তোমাদের জাত বেজাত ওরা মানে না। ওরা জানে দু'টো জাত—বড়লোক আর গরীব।

মাঝে মাঝে ওরা কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ীতে রাত কাটাতে আসত। বেশ ভদ্রলোকের ছেলে, রাতভোর কত সব তর্ক-বিতর্ক করত, আমার ঘুম আসত না। বিরক্ত হ'লে বলত, 'আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান ঠাকুরমশায়, আমরা সব রঘু ডাকাতের চেলা, এক একটা বড়লোক ধরব, আর হাড়িকাঠে লাগাব। কি, পারবেন তো, বলিদান দিতে?' '—হরে কেষ্ট, হরে কেষ্ট, আমি হ'লুম বোষ্টম সন্তান, পেটের দায়ে কালী পুজি। আমি করব বলিদান? তা যাই বল, ছেলেগুলোর বুকের পাটা আছে।'

সেদিন ঠাকুরের দীর্ঘস্থায়ী ভাষণ শুনবার অবসর ছিল না সুখময়ের। কিন্তু আজ রোগশয্যায় শায়িত সুখময় সেই নকশালদের কথা ভেবেই চলেছে। তাদের কল্যাণেই সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে হাসপাতালে আশ্রয় পেয়েছে। অদৃষ্ট, অজ্ঞাত নকশাল বীরদের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় তার মন কৃতজ্ঞতার মধুর রসে কানায় কানায় ভ'রে উঠল।

পুলিশ সুপারের কাছ থেকে পরোয়ানা পেয়ে, হীরাপুর থানায় বড়বাবু স-মনিব অনুকূল বাগ্‌দীকে মোষের গাড়ী সমেত দু'জন সশস্ত্র পুলিশের হেফাজতে সদর থানায় চালান দিল। দীর্ঘ কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম ক'রে, নাকের জল চোখের জল সব শুকিয়ে, আলা-মোষের মতই ওরা পৌঁছাল সদর থানার উঠোনে।

গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে একজন কনস্টেবল অপর পুলিশটির বন্দুকে বাঁধা চেনটির মধ্যে পা জড়িয়ে, সশব্দে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল। ক্লান্ত অনুকূলের বদ্ধ ঠোঁটের অর্গল ভেদ ক'রে ফিক্ ক'রে একটা হাসি বের হ'ল। হাঁটু ও কনুই থেকে কাঁকর ছাড়াতে ছাড়াতে সে অনুকূলের পাঁজর লক্ষ্য ক'রে প্রচণ্ড এক লাথি বসালো। ছোকরা অনুকূল তড়িতে সরে যেতেই লাথি পড়ল গিয়ে অনুকূলের মনিব টাকু মোড়লের কোঁকে। কতুরে উঠে কাঁকরে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল টাকু মোড়ল। মনিবকে ধুলো থেকে তুলে ভয়ে ভয়ে অনুকূল টাকু মোড়লের পিছু পিছু থানার ভিতর প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলের গালে এক চড় মেরে বিভূতি দারোগা ওদের অভ্যর্থনা জানাল। অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত অনুকূল মেঝের ওপর ব'সে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দারোগা মারল আর এক লাথি।

পুলিশের প্রহারের বহর দেখে টাকু মোড়লের চক্ষু চড়কগাছ। গাল জোড়া ক'শের দাঁতের সুড়ঙ্গে গেল ঢুকে। দারোগাবাবুর চোখে-মুখে কোন ভাবান্তর নেই। সিগারেট ধরালেন। শায়িত অনুকূলের দিকে একবার তাকিয়ে, টাকু মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বেটা সুখময় সাহাকে ভর্তি করেছিল?' হারিশের ক্ষত-স্থানটি মোড়লের টিপ্‌টিপ্ করছে, এই বুঝি রক্তস্রাব হয়। কথা বলার যেন শক্তি নেই। শুধু মোড়ল ঘাড় কাত ক'রে সম্মতি জানাল। এবং কেবলই আশঙ্কা করতে লাগল, এই বুঝি দারোগাবাবু এক থাপ্পড় মেরে বসেন!

বিভূতি দারোগা শুক্‌নো ঝিঙের মত মুখটা আরো ছুঁচালো ও সম্প্রসারিত ক'রে টাকু মোড়লকে বললেন, 'হীরাপুরের হাসপাতালের ডাক্তার বাবুকে পিস্তল চমকে দু'জন নকশাল যুবক, তাদের একজন

আহত, সুখময়কে হাসপাতালে ভর্তি করতে বাধ্য করেছে ; কাঁধ থেকে গুলি বের করিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। সুখময় অনুকূলের নাম করেছে। আর ঐ ব্যাটা অনুকুল মিথ্যে কথা বলেছে।'—প্রত্যুত্তর কি হবে, টাকু মোড়ল ভেবে পায় না। উপবাসক্লিষ্ট টাকু মোড়লের দুর্বল দেহটি উৎকণ্ঠায় নীল ফতুয়ার নীচে ঘেমে উঠল। তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল চাইল টাকু মোড়ল। দ্রুততম জলপানে তার হৃৎপিণ্ডটি ঢুই ঢুই ক'রে উঠল। কাঁধের গামছা দিয়ে ক'ষেব গড়িয়ে পড়া জল মুছতে মুছতে মোড়ল অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'হুজুর, একগাড়ী চেঁড়ানো তাল কাঁড়ি পড়েছিল লাওতাড়ায়, ভাবলাম কে লিয়ে যায়, তাই অনুকূলকে আমি কাঁড়ি আনতে পাঠিয়ে ছিলাম।'

অনুকূল এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। মনিবেব কথার 'ল' ধরে বলল, "ক-দিন থেকেই হুজুর, সুখোর বোলই হয়েছিল, 'অনুকূল, আমি বোধহয় আর বেশীদিন বাঁচব না রে, তুই একদিন আমাকে হীরাপুরেব হাসপাতালে থুয়ে আয়'। সে-দিন খুব ডাওর করেছিল, মালুই গাড়ী, ভাবলাম লিয়ে যাই। হীরেপুরের হাসপাতালে হুজুব, যেতেই দেখলাম, সুখোব হাঁ-চাঁ নাই, সারা ছাহ কালানী মেরে যেয়েছে। আমার খুব ডর্ হ'ল। ভাবলাম, সুখো বুঝি বা মোল। আমি চোখ নাক বুজে, ওকে চ্যাংদোলা ক'রে চটশুদ্ধ তুলে হাসপাতালের চাতালে থুয়ে সোটান লাওতাড়া চলে যেলাম"—আসামীদের কথাবার্তা শুনে, পুলিশী তদন্তেব অ-সার আড়ম্বরেব অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিফলিত হ'ল বিভূতি দারোগার মনে। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল, পুলিশ সুপারেব উপর। বাঁ হাতে আঙুলের ফাঁকে ধরা আধপোড়া সিগারেটটি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন দারোগাবাবু। টাকু মোড়লদের দিকে তাকিয়ে ঘৃণাভরা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, 'ভাগ্'!

থানা থেকে সরাসরি জিপে উঠে পুলিশ সাহেবের অফিসের দিকে রওনা হলেন বিভূতিবাবু। ইদানিং তাঁর মদের মাত্রা বেড়েছে। তলপেটটা চিন্‌চিন্ ক'রে জ্বালা করছে। ছেলে দু'টো ঠায় বাড়ী ব'সে, স্কুলে পাঠাতে ভয় হয়, পুলিশের ছেলে বলে হয়তো খুনই ক'রে

বসবে। আর স্কুল পাঠিয়েও কোন লাভ নেই। লাইব্রেরী ল্যাবো-রেটরী সব পুড়ে ছাই। স্কুলের মাথায় লাল পতাকা তোলার নিত্য নূতন রোমাঞ্চকর অভিযান। জেলা শহরে পোস্টার পড়েছে, "গরীবের বন্ধকীমাল বিনা সুদে ফেরৎ দাও। না দিলে, প্রাণদণ্ড।" ভাবতেই গা শির্ শির্ করে বিভূতি দারোগার! শহরের চৌরাস্তায় ট্রাফিক পুলিশটাকে খুন ক'রে তার পিস্তল ছিনতাই ক'রে হাওয়া হয়েছিল কে, তিনি জানেন। পাড়ার ছেলে, গায়ে হাত দিতে সাহস পাননি বিভূতিবাবু। কিন্তু তোরা কি পারবি, বিপ্লব করতে? নাদান বাচ্চা! জানিস্, তোদের দলে পুলিশের ডিম কত দ্রুত ফুটছে। এখন না হয় তোদের ভয়ে মুখটি কেউ খুলছে না। তাছাড়া আমাদেরও তেমন তাগদ্ নেই। তবে তোদের দিনও ঘনিয়ে আসছে, তা বুঝতে পারছি। গেরিলা দমনের প্রশিক্ষণ খোদ্ আমেরিকা থেকে আমদানী করছে সরকার। কয়েক ব্যাটেলিয়ন সি. আর. পি.-ও নেমেছে, মিলিটারী কোমিংও সুরু হ'তে পারে। ভাবী নিরাপত্তার কথা চিন্তা ক'রে বিভূতিবাবুর ভয়টা তবুও একটু কাটল।

পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে জিপ ভিড়িয়ে, দারোগাবাবু সরাসরি পুলিশ সুপারের অফিসে ঢুকে সাহেবকে স্যালুট ক'রে দণ্ডবৎ হলেন। সাহেব অবেলায় বোতল চারেক বিয়ার পান ক'রে ঢুলু ঢুলু চোখে, আরাম চেয়ারে কোল কুঁজো হ'য়ে ব'সে সামনের দিকে চেয়ে আছেন। পেট ফুলে ঢাঁই। বিভূতিবাবুর স্যালুটে ঢুল ভাঙল। বিভূতিবাবু সংক্ষেপে তাঁর নিষ্ফল তদন্তের কথা প্রকাশ করলেন। পুলিশসাহেব রিপোর্ট শুনে, মৃদু হেসে, চোখের ইসারায় দারোগাবাবুকে চলে যেতে বলে বোতলের তলানীটুকু নিঃশব্দে মুখে ঢেলে নিলেন। উদরে কানায় কানায় কানাকানি, বুকে মুখ গুঁজলেন পুলিশসাহেব।

একমাস অতিক্রান্ত। ডাক্তার কুমারের প্রযত্নে সুখময় অস্থিবিভাগে স্থানান্তরিত। এক্সরে প্লেটে সুখময়ের মেরুদণ্ডে ক্ষয়রোগের দাঁতের ছাপ খুব স্পষ্ট। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। তবে এ-ধরণের হাসপাতালে ক্ষয়রোগীকে বেশীদিন রাখার নিয়ম নেই। নিরাময়

যক্ষা-হাসপাতালে ভর্তির সুপারিশ-পত্র হাতে ধরিয়ে, বক্ষাবরণী পরিহিত কমরেড সুখময়কে বিদায় জানাল সদর হাসপাতাল। বিদায়কালে ডাক্তার কুমারের দেওয়া পরিচ্ছন্ন জামার পকেটে পাঁচটাকার নোট পুরে সুখময় দক্ষিণের সদর দরজা দিয়ে বের হ'য়ে এল।

সম্মুখে প্রসারিত পূব থেকে পশ্চিমে জেলা পর্ষদের পাকা রাস্তা। থমকে দাঁড়াল সুখময়। দু'পাশে দু'বার তাকিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের কোন ফারাকই নজরে পড়ল না সুখময়ের। চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল সুখময়। ও যেন এখন কান পেতে প্রাণের নির্দেশ শুনে নিতে চায়। চুপি চুপি প্রাণ বলে, "সুখময় কোথা যাও? কে আছে তোমার? ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান? তুমি কি মরতে চাও?" মাথা নেড়ে সুখময় প্রতিবাদ জানায়। "তবে চল, নিরাময় হাসপাতালে—ওখানে ভর্তি হলে, তুমি বেঁচে উঠবে।"

প্রাণের নির্দেশ মেনে নেয় সুখময়। কিন্তু নিরাময় কোন্ দিকে? ভেবে চমকে উঠল সে। হাসপাতালের দুধের বালতি হাতে হাঁ করে সুখময়ের বক্ষাবরণীর দিকে চেয়ে আছে এক গোয়ালা। সুখময় তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'নিরাময় কোন্ দিকে?'—বিস্মিত গোয়ালা পশ্চিমে ইঙ্গিত করল।

সুখময়ের পায়ে বাজল পশ্চিমের টান। পথে পড়ল পা। পথ টেনে নিয়ে চলল সুখময়কে পূব থেকে পশ্চিমে—দূরে আভাসিত গিরিডাঙার শাল-মহুয়ার বনের যেখানে সুরু। সুখময়ের পায়ে পায়ে তার স্ফীত বক্ষ কালোছায়া সকালের সোনালী রোদে ভাবী আরোগ্যের আনন্দে নাচতে নাচতে অগ্রসর হ'ল। দু'ধারে সবুজ ধানক্ষেত ঝলমল করছে। দেখে মনে হচ্ছে, হাজার অবুঝ সবুজ দামাল শিশু সোনার বালা প'রে, হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাড়ু পাবার লোভে নাচছে। সুখময় এগিয়ে চলে।

হঠাৎ ওর চলার ছন্দ মন্থর হ'য়ে আসে। কোন্ নিষ্ঠুর চিন্তার অদৃশ্য ছোবলে সুখময় ঝিম্ মেরে যায়। নিরাশ্রয়, অসুস্থ সুখময়ের

কাছে আশ্রয়ের অভাব বড় হ'য়ে দেখা দেয়। বাড়ী? ফিরে, কোন্ কাজে লাগবে সে? বুকে বসানো প্লাস্টারের খাঁচা! দেখলে কেউ ছায়া মাড়াবে না। ছাগল-গাড়াতেই ছেঁড়া চটের ওপর শুয়ে থাকতে হবে! দানাপানির কী হবে! মায়ের খোঁজে টাকু মোড়ল আসবে। জিজ্ঞাসা করবে 'সুখো, তোর মা কই?' বাবার মুখও অনেক ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছে। বাড়ীর কারই বা কী কাজে লাগবে? গলায় গলায় গলগ্রহ হ'য়ে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ! অথচ কেন যে সে বাঁচতে চায়, কেমন ক'রেই বা বাঁচবে কোনটাই বুঝে উঠতে পারে না সুখময়। নাচ থামিয়ে সুখময়ের ম্রিয়মান ছায়া কালো কাছিমের মত সুখময়ের পায়ের কাছে লুটোপুটি খাচ্ছে। পাশ দিয়ে বক্রেশ্বরের বাস ছুটে গেল। ডিজেলের অপরিচিত গন্ধে সুখময়ের গা বমি বমি করে।

পথশ্রমে ক্লান্ত সুখময় বিশ্রামের আশায় একটি কাদা-জাম গাছের নীচে বসে পড়ল। দূরে, ভরা ধান ক্ষেতের পাশে দেখল, এক চাষী লাঙল-মই কাঁধে নিয়ে মুখ-বাঁধা এক জোড়া বলদ গরুর পিছু পিছু আলপথ ভেঙে গ্রামের পথে ফিরছে। আকাশে নজর বুলিয়ে দেখল, সূর্যদেব মাথার উপরে দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলছে। সামনে পড়ে আছে অচেনা দীর্ঘ পথ।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত সুখময় তার অসহায় অবস্থাটি অনুমানে সক্রিয় হ'ল। সত্ত সরলীকৃত মেরুদণ্ডের প্রাচীন ব্যথাটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিন্‌চিন্ ক'রে মোচড় দিয়ে উঠল। রাস্তাটির সামনে, পশ্চিম প্রান্তে দেখা যায় শালপাতার বিশাল বাণ্ডিল মাথায় দু'টি সাঁওতাল যুবতী গান করতে করতে এগিয়ে আসছে।

দিশেহারা সুখময় এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখে, হাত দুয়েক পশ্চিমে, ঘাসের ওপরে বেশ কিছু কাদাজাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। পাকা জামের পূর্ব-স্বাদের অভিজ্ঞতা সুখময়ের রসনাকে লালায়িত করে। সংগ্রহে আপত্তি দেখা দেয়। জম্বুরস পানেচ্ছু কিছু সংখ্যক রসিক হাঁড়ি বোলতা পড়ে থাকা কাদা-জামগুলির উপর গুনগুনিয়ে রসভোগে লিপ্ত। সুখময় হাঁটু গেড়ে গুটিগুটি কাদা জামের

কাছাকাছি হ'তেই বোলতারা তেড়ে আসে। আত্মরক্ষার্থে সুখময় আবার ছিটকে ফিরে আসে। বোলতারা বহুৎ খতর্নাক্। কিছুতেই সুখময়কে জামের কাছে যেতে দেবেনা। নাছোড়বান্দা সুখময় বারবার হাত বাড়ায়, আর স'রে আসে। ইতিমধ্যে সাঁওতাল যুবতীদ্বয় অকুস্থলে হাজির হ'য়ে সুখময়ের কাণ্ড দেখে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে। অতর্কিত হাসি শুনে সুখময় ভ্যাবাচাকা খেয়ে ফিরে তাকাল।

কোন কথা না বলে একজন সাঁওতাল যুবতী মাথার বোঝা মাটিতে নামিয়ে মাল-কোঁচা মেরে কাপড় প'রে তরতারয়ে গাছে উঠে পড়ল। পাকা জাম পেড়ে বুক-আঁচলে রাখে, মাঝে মাঝে জামডালের ডাল ধ'রে নাড়া দেয়। ঝরঝরিয়ে জাম পড়ে তার বুকের আঁচল ছাপিয়ে সুখময়ের মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে। দুটো পাকা জাম মুখে পুরে উপরে তাকায় সুখময়। নিরাবরণ বক্ষ সাঁওতাল যুবতী সুখময়ের রসকণ্ঠী পুলক-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ডাল ধ'রে নাড়া দেয়। জাম বৃষ্টিতে ঢাকা পড়ে সুখময়। মনের আনন্দে জাম কুড়িয়ে মুখে পোরে। আঃ! কি রসাল! কি মধুব! মানসিক খেদ-অবসাদ লুপ্ত হয়। আনন্দিত সুখময়ের কাছে এ পৃথিবী বড়ই রসাল ও মধুময় হয়ে ওঠে।

গাছ থেকে অবতরণ ক'রে, একমুঠো জাম সুখময়কে উপহার দিয়ে শালপাতার বোঝা মাথায় চাপিয়ে সাঁওতাল কন্যারা পুনরায় বুনো গানের কলি ছড়িয়ে কুলি কুলি শহর-বাগে চলে যায়। ডাক্তার কুমারের উপহৃত, জম্বুরসসিক্ত পিরাণটির দিকে চেয়ে সুখময়ের মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। বুক-পকেটে হাত দিয়ে পাঁচটাকার নোটটির অস্তিত্ব অনুভব করে, সন্দেহ নিরসনের জন্য বুক পকেট থেকে হাসপাতালেব সুপারিশপত্রে মোড়া নোটটি বে'র করে দেখে। না কোন ছাপ নেই। জামের রসে হাসপাতালের কাগজটি স্থানে স্থানে ছেপে গেছে। মিশ্র অনুভূতি নিয়ে সুখময় পথে নামে।

ডাক্তার কুমারের মুখের বৈরাগী হাসি ভেসে ওঠে সুখময়ের মনে। ডাক্তারবাবুরা কত ভাল। চোখ দেখলেই মনের কথাটি টের পান।

নিরাময় হাসপাতালের ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই তাকে ভর্তি ক'রে নেবে। হাসপাতালের কাগজে জামের রস লেগেছে বলে ফেরৎ পাঠাবে না। চলতে চলতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুখময়।—দু'ধারে সবুজ ধানক্ষেত। দূরে, ভাতুণ্ডী পাহাড়ের চূড়ায় একা একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে তালগাছটি।

কিন্তু ওরা? সুখময়ের নাম রেখেছিল 'কমরেড', যাদের কল্যাণে সে জীবন ফিরে পেয়েছে? সেই অচেনা, অদৃশ্য বন্ধু নকশালদের জন্যে মন কেমন করতে লাগল।

হঠাৎ দুলে উঠল ওর মন। বাবার যোজনা করা গানের একটি কলি গুনগুনিয়ে বেরিয়ে এল সুখময়ের কণ্ঠে। সুখময় গাইতে লাগল,

ও আমার হঠাৎ পাওয়া ধন—
কোথায় তোরে রাখবো ধরে করি সযতন।।
বুকের মাঝে রাখি যদি ঝরে নয়ন নিরবধি
রাখলে তোরে মাথার প'বে, মানে না এ মন।।

শ্রাবণেব একখণ্ড কালো মেঘ তাকে ছাতা ধ'রে নিয়ে চলে পশ্চিমের পথে।

গিরিডাঙার বন। শাল-মহুয়ার সবুজ নরম বিছানায় শুয়ে লাল টুক্‌টুকে সূর্য একটু গা গড়িয়ে নিচ্ছে। গোধূলির রঙ ভাল ক'রে মাখতে না মাখতে বনস্থলী প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর হ'য়ে উঠল। ক্ষুন্নিবৃত্তি সেরে ফেরারী পাখীরা ঝাঁক বেঁধে ঘরে ফেরে। প্রিয়মিলনের কুজন-ধ্বনিতে সরগরম বনস্থলী, শিকারী শ্বাপদের চোখে উজ্জলতা বৃদ্ধি ক'রে সন্ধ্যা নামল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলেও, গিরিডাঙা ভিজে মৌসুমী বাতাসের স্পর্শ পেয়ে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল। বকুলফুলের কুঁড়ির মত বাঁকা চাঁদ উঠেছে আকাশে।

ক্রমে রাত বাড়ে। চক্রাকারে ঘনীভূত বর্ষার কালো মেঘে আকাশ ঢাকে। কালপ্যাঁচা ডেকে ওঠে। নীরন্ধ্র অন্ধকার যেন কান খাড়া ক'রে শুনছে, দূরে শুক্‌নো পাতার উপর কারা যেন

সতর্ক নেকড়ে-পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ধারালো চোখে শ্বাপদেরা কান পেতে প্রতীক্ষা ক'রে রইল সেই দূরাগত পদধ্বনির।

প্রাচীন নিমগাছটার দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে পাকা সড়ক ময়াল সাপের মত সাটপাট দিয়ে শুয়ে আছে, ল্যাজা-মুড়ো দেখা যায় না। এই পাকা রাস্তার ধারেই নীলকর সাহেবদের লতাপাতার জঙ্গলে ভরা পোড়ো, ভাঙ্গা ন্যাড়া বাড়িটা থেকে কয়েকটি অবুঝ বাদুড় ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে উড়ে গেল।

ভগ্ন অর্গল, ন্যাড়া ছাদ এক কুঠরি রাস্তা মুখো ঘরের চাতালে সুখময় কখন এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তা কেউ জানে না। বাদুড়ের ডানার ঝাপ্‌টা লেগে সুখময়ের নাক-চোখ শুংশুং ক'রে ওঠে। বদ্ধ-আঁখিপাতায় ভ্রূকুটি জাগে। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল সুখময়,—ও নয়নবাঁধে নিজের বাড়ী ফিরে গেছে। কোথা ছিল ছোট বোন, এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। মায়ের পরনে ধবধবে রাঙাপাড় শাড়ী। সতেল কালো চুলের সিঁথিতে সিঁদুরের ঘোর। হঠাৎ বাবা বাড়ী ফিরল, বাবাকে দেখে মা লজ্জায় থম্‌কে দাঁড়াল। চোখাচোখি হ'তেই মাকে খুঁজে পায় সুখময়। আদরে, সোহাগে স্নেহময়ী জননী ষণ্ডেশ্বরী সুখময়কে বুকে জড়িয়ে ধরে। বেজন্মা ভাইটি গুটি-গুটি এসে, সুখময়ের দিকে কচি দাঁত বের ক'রে হোঁসর-ফোঁসর ক'রে আনন্দে আকুলি বিকুলি করতে লাগল। আনন্দাশ্রুতে ভেজা বাবার দু'চোখে খুশীর জোয়ার দু-কূল ছাপিয়ে উঠেছে। সুখময়ের মনে হ'ল, বাবা বুঝি এবার তার স্বরচিত গান জুড়ে দেবে।

এতক্ষণ মনের আনন্দে নিমের ফল খাচ্ছিল একটি শৃগাল। হঠাৎ চমকে উঠতেই ভয়ে ভয়ে দু'বার ডেকেই কালবিলম্ব না করেই চলে গেল। স্বপ্নের ঘোর ভেঙ্গে জেগে উঠল সুখময়। উঠে বসে, চোখ ক'চ্‌লে স্বীয় স্থান-কাল-পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল।

মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে গিরিডাঙার শাল-মহুয়ার বনের গভীরে জমাট অন্ধকারে জীর্ণ নীল কুঠি প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর কঙ্কালের মত পড়ে রয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমের ঘর থেকে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ঔৎসুক্যে উদ্বেগে প্লাস্টার্ড পাঁজরের নীচে সুখময়ের হৃৎপিণ্ডটি ধুক্‌ধুক্ ক'রে উঠল। সে কি ভূতপ্রেতের ডেরাতে আসর পেতেছে? নাকি কোন চোর ডাকাত কথা বলছে?

চারপাশে তাকিয়ে কিছুই নজরে পড়ে না। কণ্ঠস্বর অনুসরণ ক'রে নিপুণ কাঠবেড়ালীর মত হাত বোলাতে বোলাতে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় সুখময়। মুখ-চোখে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে, শ্যাওলা-ঢাকা ভিজে ইটের গন্ধ শুঁকে, কয়েকটি ব্যাঙের মাথায় পা দিয়ে এগিয়ে চলে সুখময় কণ্ঠস্বরের খুব কাছাকাছি।

কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হয়। বন্য গুল্মে ঘেরা নীলকুঠি থেকে কে একজন চাপা গলায় বলছেন, 'কমরেডস্!'—অমোঘ কর্তৃত্বব্যঞ্জক গম্ভীর সে কণ্ঠস্বর! সুখময়ের কল্পনায় আগুন ধরে। গভীর অন্ধকারে সুখময় শুনতে লাগল, কণ্ঠস্বর তখন বলে চলেছে, 'বিরাট ঘেরাও দমনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাময়িকভাবে দু'একটি লড়াই-এ আমাদের বিপর্যয় ঘটেছে। আমরা ধাক্কা খেয়েছি। কমরেডস্, বিপ্লবের পথ আঁকাবাঁকা। তাই সহজ বিজয়লাভের কথা আমরা চিন্তা করছি না। এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে. আর এভাবেই শত্রুর এবং আমাদের মধ্যেকার শক্তির ভারসাম্য ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে হবে। সংগ্রাম যখনি নূতন পর্যায়ে ওঠে বা তার গুণগত পরিবর্তন হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতা আসে, সংগ্রামের নূতন স্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, তাই পার্টিকে, সংগঠনকেও ঢেলে সাজাতে হয়।'—পটলের মতো ফালা ফালা ক'রে চোখ-জোড়া চিরেও সুখময় ওদের দেখতে পায় না!

সুখময়ের বোধগম্যতাকে উপেক্ষা ক'রে শব্দ-তরঙ্গ ভেসে গেল! ক্ষণিকের নীরবতা ভেঙ্গে জেগে উঠল তীব্র, তিক্ত একটি কণ্ঠস্বর—'ঠিকই বলেছেন কমরেড! সংগ্রামের তাল কেটে গেছে। বিপ্লবের আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার অন্দরমহলে পর্দানশীন বেগমের মতই

অসহায় আজ আমরা। আমাদেব গতি গেছে থেমে। আমাদের নেতা একদিন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে বলেছিলেন। আমরা স্বপ্ন দেখলাম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের। জনগণের একটি আন্দোলনেও হাত লাগালাম না সব গণফ্রন্ট ভেঙ্গে দিলাম। নেতা আদেশ দিলেন, জনগণের সঙ্গে একাত্মীয়তা অর্জন কর। জনগণের সেবা কর। রুখো চুলে, ভূখা পেটে, দাঁত না মেজে, দারিদ্র্যের সব হতশ্রী অনুকরণ করলাম! আত্মীয়তা গড়ার অবকাশ ছিল কই! চেয়ারম্যানের চীন যে আক্রান্ত হ'তে চলেছে। ভালবাসা তো দূর অস্ত! আমার বিপ্লবী স্বপ্নের কামানের গোলা, গ্রামীন সর্বহারাকে অ্যাকশন স্কোয়াডের নেতা সাজালাম! এভাবেই গেবিলাদলের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যবিত্ত রঙ আড়াল করলাম! ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মতো এগিয়ে যাও! ঢেউ কই! এযে মড়া চাঁচড় বালির চড়া! জনগণের জলাশয়ে মাছেরা আজও বিচরণ করে তো কমরেড! জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্যই রাজনীতি মরণকে বেছে নেয়। শহীদের ব্যক্তিগত অমরত্বলাভের জন্য নয়। মরণজয়ী কোন অতি-মানবের আবির্ভাব কামনাতেও নয়।'

...মধ্যপথে দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরকে চোখ রাঙিয়ে ধমকে উঠে প্রথম কণ্ঠস্বর বলল, 'চুপ করুন কমরেড! বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রিকতাকে নস্যাৎ ক'রে, শত্রুর আক্রমণের মুখে পার্টিকে অসহায় অবস্থায় তুলে ধরতে চাইছেন কোন্ মতলবে? লড়াই থেকে সরে এসে বুলি কপ্‌চানোর যুগ এটা নয়। সন্দেহ, হতাশা, দূর্বলতা এসব বুর্জোয়া ব্যাধির বীজ ছড়াবেন না কমরেড! অনেক মূল্য দিতে হবে! বিপ্লবীরা কি মূল্য দিতে ভয় পায় কমরেড! We must dare to fight and dare to win. সারা জেলা জুড়ে আমাদের সঙ্গে আছে লাখ লাখ দরিদ্র কৃষক জনতা! আত্মদানে উদ্বুদ্ধ হাজার বিপ্লবী! আর হাতে আছে শ'দুয়েক বন্দুক আর রাইফেল,...কমরেড বাবুলাল —রেজিমের পথেই এগিয়ে আসছে, আসবে, মহান গণ-মুক্তি ফৌজ —কাঁধে রাইফেল...চেয়ারম্যান মাও আশীর্বাদবাণী পাঠিয়েছেন...

ভারতের ভরসা তোমরাই···নকশালবাড়ীর লাল সূর্য সকাল আটটা ন'টার সূর্য হ'য়ে আমাদের জেলার আকাশে আজ জ্বলজ্বল করছে !'

হঠাৎ হাজার তুবড়ীর আলো জ্বেলে কয়েকটা পাইলট বোমা ফাটল আকাশে। তীক্ষ্ণ আলোর ঝলকানি লেগে সুখময়ের চোখের মণি-জোড়া ঝল্‌সে গেল মুহূর্তের জন্য। সামলে নিয়ে দু'চোখে হাত বুলিয়ে ডান পাশ ফিরে তাকাল সুখময়। দেখল, বন্দুক তাক ক'রে একদল পুলিশ গোটা নীলকুঠি ঘিরে মচ্‌মচ্‌ ক'রে এগিয়ে আসছে। গুণছেঁড়া ধনুকের মত মাথার গুল্মাচ্ছাদন ভেদ ক'রে, উঠে দাঁড়িয়ে, দু'বাহু দু'দিকে বিস্তার ক'রে জানলা আড়াল ক'রে দাঁড়াল সুখময়। মুহূর্তে কাল চিতাবাঘের মত অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল বনময়। উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস সুখময় বিড়বিড় ক'রে কী যেন বলার চেষ্টা করল। পর মুহূর্তে সুখময়ের বক্ষ-বর্ম ভেদ ক'রে একটা জ্বলন্ত বুলেট সুখময়কে এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দিয়ে চুণ বালি খষা নীলকুঠির দেওয়ালে গিয়ে ঠেকল। কড়্‌কড়্‌ শব্দে মেঘ ডেকে বৃষ্টি নামল। বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় সুখময়ের মৃতদেহ বুনোলতায় বুক রেখে ঝুঁকে পড়েছে। ওর প্লাস্টার্ড কলিজা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা লাল রক্ত টপ্‌টপ্‌ ক'রে গিরিডাঙার কোলে ঝ'রে পড়ছে।

হারাঠাকুরের বিয়ে

ঝিকিমিকি বেলা। মুখ-আঁধারী ভালাসের মাঠ। অনতিদূরে মানিকপুরের পাঁচু মোড়লের খামারে বাঁধা সগুসন্তানহারা গাভীটির হাম্বা রব করুণ অন্ধকারে ভাসিয়া আসিতেছিল। সারাদিন ধরিয়া গুমট গরমে অর্ধসিদ্ধ অবস্থায় মাঠে মাঠে আল-পথ বরাবর হাঁটিয়া আসিতেছেন হারাঠাকুর—বিলাসপুরের নামকরা কুলীন নিকুঞ্জ ঠাকুরের শেষ বিপত্নীক বংশধর।

নদীর এপারের জনশ্রুতি ঠাকুরমশায় নাকি দশ সের গুড়ে-ভরা কাঁসার জামবাটি অগস্ত্য ঋষির মতো এক চুমুকেই নিঃশেষ করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার তেল-চুকচুকে পিতলের গামলার মতো উদর অনেকেরই সম্ভ্রম ও ঈর্ষার বস্তু ছিল।

সঙ্গে নয়-আনা দামের জিলজিলে গামছায় বাঁধা সাঁইথিয়ার শিষ্যবাড়ির শ্রাদ্ধে পাওয়া চাল, পান, সুপারি ও পাটালি। ঘামে-ভেজা ফতুয়াটি ডান কাঁধে চাপানো, বাঁ হাতে-ধরা দড়ির সঙ্গে বাঁধা একটি এঁড়ে বাছুর—যজমান শিষ্যের দান।

মোড়ল-শিষ্য উমাতাঁতি যৌবনে পাঁচনের বাড়িতে একটি গো-শাবক হত্যা করায়, তাহার পুত্র অনন্তকে শেষ শয্যায় গুরুমশায়কে একটি এঁড়ে বাছুর দান করিবার জন্য তিনসত্য করাইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পুত্র অনন্ত বউ-এর সোনার শাঁখা-বাঁধুনী মহাজনের ঘরে বন্ধক রাখিয়া নয় টাকায় এক এঁড়ে বাছুর কিনিয়া পিতার শ্রাদ্ধবাসরে কুলগুরু হারাঠাকুরকে তাহা দান করিয়া পিতৃসত্য পালনের ধর্মটুকু কড়ায়-গণ্ডায় তুলিয়া লইয়াছে।

রৌদ্রে ও তৃষ্ণায় কাতর গো-শাবকটি সম্মুখ গমনে পরাঙ্মুখ প্রায়শ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে লাগিল। উন-ষাটে হইয়া হারাঠাকুর ভালাসের মাঠে ত্রি-সন্ধ্যাকালে চারি দিক ত্রস্তভাবে লক্ষ্য করিয়া গো-শাবকের লেজ ধরিয়া টানিতে টানিতে কুৎসিত ভাষায় নিজেকে

ও স্বর্গত শিষ্যের অনন্ত নরক কামনা করিয়া শাপ-শাপান্ত করিতে লাগিলেন।

নির্বংশে হারাঠাকুর দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হওয়ায় মনের খেদে কেশপাশ সম্পর্কে উদাসীন হইয়া উঠিয়াছিলেন। লোকে বলিত, 'হারাখ্যাপা'। আসলে কংসারী নাপিত বিনা পারিশ্রমিকে ঠাকুরের তৈলহীন রুক্ষ কেশভার মোচন করিতে রাজি হয় নাই। আ-নিতম্ব কেশপাশ চিটচিটে আঠালো ঘামে কণ্ঠে ও পৃষ্ঠে আটকাইয়া যাওয়ায় হারাখ্যাপার সারা অঙ্গ কুট কুট করিয়া উঠিল।

নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এঁড়ে বাছুরটি অন্ধকার আকাশের দিকে ঠ্যাং তুলিয়া ঠাকুরমশায়ের সমস্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়কে ব্যঙ্গ করিয়া ভালাসের মাঠে গলায় দড়ি গো-জন্ম হইতে অবশেষে খালাস পাইল। ঠাকুরের ধূলিমলিন পদাঘাতকেও উপেক্ষা করিয়া যখন গো-শিশু নির্বিকারে পেট ফুলাইয়া পড়িয়া থাকিল তখন ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হারাঠাকুরের হৃৎপিণ্ডটুকু দুঃখে ও আশঙ্কায় ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল।

ডাঁট-ভাঙা কারের দড়িতে বাঁধা সিউড়ির বটতলায় ন-সিকিতে খরিদ করা চশমাটি খুলিয়া কাপড়ের খুঁট দিয়া কাঁচ মুছিতে মুছিতে ভাবী গো-দানার আতঙ্কে ভর ভর করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আত্মরক্ষার্থে গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ দ্রুত পদবিক্ষেপণকারী হারাঠাকুরের ক্রন্দনের সহিত মিশিয়া অন্ধকার ভালাসের মাঠে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

ক্রমে পথ নির্জন ও রাত্রি গভীর হইল। সামনেই কাঁদর পার হইলেই বিলাসপুর। ক্লান্ত কুকুরের মতো শ্বাস-প্রশ্বাসকে কোনোক্রমে চালু রাখিয়া হারাঠাকুর বিলাসপুরের পশ্চিম সীমানা-বরাবর বেনে কাঁদরের ধারে আসিয়া পড়িলেন। পূর্ণগর্ভা গাভীর মতো হাঁটু গাড়িয়া কাঁদরের কর্দমাক্ত জল অঞ্জলি ভরিয়া ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ঠাকুর কাঁদরের তীরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য বসিলেন এবং জল পানান্তে স্বস্তির ঢেকুর তুলিয়া সম্মুখে তাকাইবা-মাত্র 'বাপ রে' বলিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইয়া মূর্ছায় ঢুলিয়া পড়িলেন।

কারণস্বরূপ জানা গেল, কয়েক হাত দূরে একটি অর্ধোলঙ্গ লোক হাত মেলিয়া কেবল উড়িবার চেষ্টা করিয়া ভূপতিত হইতেছে। স্থানটি রীতিমতো ভীতিপ্রদ। গ্রামবাসী তাহাদের মৃত সন্তানদের কোদালের বাঁট দিয়া এই বেনে কাঁদরের ধারে পুঁতিয়া রাখে। বোঝা-গেল উল্লম্ফিত প্রেত দর্শনের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় ঠাকুর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ 'বাপ রে' শব্দটিতে সাধনা বিঘ্নিত হওয়ায় শূন্যে লম্ফদানকারী ব্যক্তিটি হারাঠাকুরের মূর্ছিত দেহটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—সাধক গোপীনাথ।

অবসরপ্রাপ্ত ন-পাড়ার স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক নগেন চাটুজ্জে এক পুত্র ও এক কন্যা থাকা সত্ত্বেও অধিক বয়সে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। গোপীনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শহরেই বসবাস করিতে হয়। বৃদ্ধ পিতার সংসারে কানাকড়িও সাহায্য করিতে পারে না বলিয়া আপোগণ্ড গোপীনাথ সহ সংসারের সব দায়-দায়িত্ব হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখিয়াছে। গোপীনাথ কিছুকাল পিতার সহিত খাঁপুরে পড়িতে গিয়াছিল। নগেন চাটুজ্জে খাঁপুরে খাওয়া-বাদে মাসিক একমণ ধানের বিনিময়ে একটি পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীনাথের আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপে স্থির থাকিতে না পারিয়া স্ব-ভিটায় ফিরিয়া ধুঁকিতেছেন। গোপীনাথের পড়াশুনা খাঁপুরের পাঠশালাতেই শেষ। গৃহে ফিরিয়া পিতার গ্রন্থভাণ্ডার হইতে একটি গীতা, একটি চণ্ডী ও একটি পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়া পাড়াপ্রতিবেশীকে উচ্চকিত করিয়া উহা হইতে নির্যাসটুকু বাহির করিয়া যত্রতত্র বিতরণ করিতে লাগিল। শালপূজা, ষষ্ঠীপূজা, হরির লুট দিতে গোপীনাথের ডাক পড়ে। বিনা দক্ষিণায় মোড়লরা ধর্ম অর্জন করে। দুহাত তুলিয়া সারা বৈশাখ মাস ধরিয়া গ্রামে সংকীর্তনের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্য হইয়া নাচে। সর্পসিদ্ধি লাভার্থে বিধবা পিতৃষ্বসার বৃন্দাবনী চাঁদির ঘটি আনন্দ বেদের ঝোলায় আশ্রয় লয়। কেহ বা তামাসা করিয়া গোপীনাথকে গাঁজার কলিকা ধরাইয়া দেয়।

সেদিন গোপীনাথের সাধনা ভালোই জমে। ইদানিং এক ওঝা গোপীনাথকে উড়িবার মন্ত্র শিখাইয়াছিল। প্রাক্ উড্ডয়ন পর্বে শকুনির ডিম সর্বাঙ্গে লেপনের বিধি থাকায় গোপীনাথ শকুনির ডিম সংগ্রহার্থে নাকা বাগ্‌দীকে লক্ষ্মীর ঝাঁপি হইতে একটি সিন্দুর-লাঞ্ছিত রৌপ্যমুদ্রা দান করিয়াছিল। নাকা বাগ্‌দী পরদিন কয়েকটি শালিকের ডিম গোপীনাথকে উপহার দিয়া হাসিমুখে গৃহে ফেরে। সারা অঙ্গে শালিকের ডিম লেপন করিয়া অদ্য সন্ধ্যায় গোপীনাথের বেনে কাঁদরের তীরে উড্ডয়ন-সাধনা ঠাকুরের 'বাপ রে' শব্দে বিঘ্নিত হইল।

মূর্ছিত হারাঠাকুরকে জাগাইতে না পারিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের মতোই ঠাকুরের অসাড় দেহকাণ্ডটি স্কন্ধে ধারণ করিয়া গোপীনাথ ঠাকুরের শ্রীধাম বাস্তুভিটার জীর্ণ দেউলে উপস্থিত হইল।

রাত্রি নয় ঘটিকা। সন্ধ্যা-প্রদীপে পান্তাভাতের পাট চুকাইয়া গ্রামবাসী ইতিমধ্যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছে। কুটিরের খুঁটি ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া সখুঁটি গোপীনাথ হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। কোনোক্রমে ঠাকুরকে শয়ান দিয়া পার্শ্ববর্তী কলপুকুর হইতে এক অঞ্জলী সবুজ জল গোপীনাথ ঠাকুরের বদন ও নেত্রযুগলে ছিটাইয়া দিল। অন্ধকার ভরাট হইয়া আসিয়াছে। ঘনান্ধকারে তেঁতুল গাছের ডালে কালপ্যাঁচা মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে। এক সময়ে কর্ণাঙ্কে জামদগ্ন ঋষির মতো ঠাকুর জাগিয়া উঠিয়া গোপীনাথের দিকে অপলক নেত্রে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এঁড়ে বাছুরের শোকে কাঁদিয়া উঠিলেন। বিস্মিত গোপীনাথ ঠাকুরের ক্রন্দনের হেতু বুঝিতে না পারিয়া ভীত হইয়া উঠিল এবং অতি সন্তর্পণে ঠাকুরকে চালায় শোয়াইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুরের নিমীলিত নেত্র হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, ব্যাঙের গোঙানি, প্যাঁচার চীৎকার—শেষ রজনীর শির্‌শিরে হাওয়ায় মুমূর্ষু-চৈতন্য হারাঠাকুর বেঘোরে পড়িয়া রহিল। রাত্রি অতিক্রান্ত হইল।

অতঃপর হারাঠাকুরের সন্ধান বড় একটা কেহ পায় নাই। পরান্নে পথ্যকারী হারাঠাকুরের নিজহস্তে সিদ্ধপক্কের ব্যবস্থা করা অসাধ্য ছিল। দুই মুষ্টি অন্ন ফুটাইয়া দিবার লোকের অভাবে হারাঠাকুর দুই-একদিনের বেশি গ্রামে অবস্থান করিতেন না। মাসের পর মাস সদ্‌গোপ শিষ্যদের কণ্ঠনালী-প্রান্তে তুলসীকাঠের মালা হইয়া শোভা পাইতেন। পরান্ন ভোজনে কেহ কটাক্ষ করিলে হারাঠাকুর ভ্রূযুগল ঊর্ধে তুলিয়া দার্শনিক ভঙ্গিতে নারীসুলভ কণ্ঠে বলিতেন—'ওরে থাক্ থাক্, যত সব তোদের ইয়ে।' মাঝে মাঝে গ্রামে ফিরিলে প্রতিবেশী পশু মোড়লের বাড়িতে চিড়া মুড়ি ও বারকতক দুধচিনি-বর্জিত চা পান করিয়া কাটাইয়া দিতেন।

হারাঠাকুরকে বিড়ি ক্রয় করিয়া পান করিতে দেখিয়াছে এমন কোনো ব্যক্তি ভু-ভারতে জীবিত নাই। হারাঠাকুর উঠতি ছেলে-ছোকরাদের দলকে সযত্নে নির্ভীকভাবে এড়াইয়া চলিতেন পাছে, কেহ বিড়ি চাহিয়া জ্বালাতন করে।

জনশ্রুতি, শিষ্যবাড়ি-আয়লব্ধ অর্থ ও সম্পদ ঠাকুরের এক ধনবান শিষ্যের বাড়িতে গচ্ছিত আছে। মাঝে মাঝে দূরবর্তী দুই-একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে মলিনভাবে ঘোরাঘুরি করিয়া ঠাকুর ও তাঁহার বিষয়-বৈভব সম্পর্কে খোঁজ লইতে দেখা গিয়াছে।

প্রবাসে হারাঠাকুর গল-কলস কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার নিকট স্বীয় ভূ-সম্পত্তির বিপুল ফিরিস্তি দাখিল করিয়া পরমুহূর্তে দীনকণ্ঠে ঔদাসীন্যের ময়ান দিয়া (তৃতীয়বার) দারপরিগ্রহ করাই যে তাঁহার বিধিলিপি সে-কথা সুন্দরভাবে ঘোষণা করিতে পারিতেন। পূর্ব-পুরুষের ভাগবৎপাঠের কণ্ঠস্রোত হারাঠাকুরের রক্তে এখনো ক্রিয়াশীল।

অনেক নিরুপায় পিতা ঠাকুরের সমস্ত নষ্টামি হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাঁহার হস্তে কন্যাসম্প্রদান মনস্থির করিয়া পাঁচক্রোশ দূরবর্তী রেল-স্টেশনে নামিয়া কাদা-জল আচোট ভুঁই নদী-নালা খাল-বিল পার হইয়া কুয়ে নদীর প্লাবনে ভিটেপুরী লেপাপোঁছা শ্রীধাম বিলাসপুরে

পদার্পণ করিয়া হারাঠাকুরের বর্ণিত তাঁহার দালানকোঠার খোঁজ লয়। দিনান্তে. ক্লান্ত হইয়া পড়ন্ত বেলায় কোনো গরিব ব্রাহ্মণবাড়িতে শীতলান্ন গ্রহণে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ঘরে ফেরা ক্লান্ত কাকের মতো দূর স্টেশনের পথে পা বাড়ায়।

শীতের পাকা কেঁতুরীর মতো সূর্য বিলের জলে ডুবিয়া যায়। হারাঠাকুরের খোঁজ পড়ে। দখনে খাটা মটর বাগ্‌দী রামঠাকুবেব দোকানে বসিয়া রামঠাকুরের প্রসাদী বিড়িতে সুখটান দিয়া বলে সে নাকি খাটুন্দি-পাঁড়গাঁয়ের মাঠে তিন-সন্ধ্যাবেলায় হন্‌হন্‌ করিয়া বাঁশ-পুরের দিকে ঠাকুরকে যাইতে দেখিয়াছে। সিউড়ির এজলাসের পেশকার উমাপদ বাঁড়ুজ্জে গতদিন হারাঠাকুরকে হানিয়া রোগে আক্রান্ত অবস্থায় জেলা হাসপাতালে দেখিয়া আসিয়াছে। হারাঠাকুরের প্রসঙ্গে এরূপ আচমকা সংবাদ কাকের মুখে হইলেও আসিয়া পৌঁছায়।

সেদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যা! ঝোকন ঝোকন কাজল কালো মেঘের দল নিমপাহাড়ীর শালবনে পাতা খাইতে চলিয়াছে। মেঘের কাজল ছায়া ননী ঘোষের ডাঁটালো আলতাপাটি পুঁই লতায় পড়িয়া সজল হইয়া উঠিয়াছে। শ্যাম বাগ্‌দীর কালো বকনার টানা প্রশান্ত করুণ চোখ চনমন করিয়া উঠে। পাউশের আশায় বাউড়ীপাড়ার মেয়েরা দিনান্তের উনানশালে বসিয়া জীর্ণ জালিগুলি সংস্কার করিবার নিমিত্ত শাড়ির পাড় হইতে সুতা বাহির করিতে করিতে মেঘের ডাকের শব্দে চমকাইয়া উঠিতেছে। পাঁচু মোড়ল তাহার পরিত্যক্ত নির্জন দোকানের ঘুণ-ধরা কপাটে হুড়কা লাগাইয়া মল্যানের কাছে সকাল সকাল ফিরিবাব আয়োজন করিতেছে। কারণ মেঘ ক্রমশ ঝামড়াইয়া আসিতেছে। দমকা হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। দুইচারি ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতেছে।

এমন সময় শতপটি বিবাগী ছাতাটি বশে রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে করিতে হারাঠাকুর ঝোড়ো কাকের মতো ঘনায়মান সন্ধ্যার মেঘল অন্ধকারে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। নিরন্ন-জঠর হারাঠাকুরের পদযুগল গ্রাম-রাস্তার গোখুপড়িতে কেবলই হোঁচট খাইতে লাগিল।

উষাং মোল্যানের প্রাচীরগাত্রে স্তূপীকৃত গোবরের গন্ধে নাড়ীভুঁড়ি মোচড় দিয়া উঠিল। টাল সামলাইতে না পারিয়া 'কোঁৎ' শব্দ করিয়া হারাঠাকুর মুখুজ্জেদের পোঁতার ধারে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন।

ঘনশ্যাম মুখুজ্জে অন্ধকার বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন হয়ত তাঁহাদের লালু বাছুরটি গোয়ালে বাঁধা হয় নাই। জলঝড়ে পড়িয়া হয়ত বা গোঁঙাইতেছে। বাছুরের বদলে হারাঠাকুরকে আবিষ্কার করিয়া মুখুজ্জেমশায় বিস্মিত হইয়া সেদিন সন্ধ্যার জলঝড়ে হাঁকডাক করিয়া ভ্রাতুস্পুত্র ভোলানাথকে ডাকিয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিলেন। ভোলানাথ চ্যাংদোলা করিয়া হারাঠাকুরকে বাড়ির বারান্দায় শোওয়াইয়া দিল। মুখুজ্জে-গিন্নি রাঁধিতেছিলেন ; রান্না করার পিতলের ঘটির একঘটি জল লইয়া আসিয়া হারাঠাকুরের চোখেমুখে সজোরে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন। ঠাকরুণের জলঝাপটা ও ভোলানাথের তালপাতার বাতাসে কাজ হইল। অতঃপর মুখুজ্জেমশায়েরই গৃহে দ্বিপ্রাহরিক ব্যঞ্জনের অবশিষ্ট খেঁড়ো পোস্ত, কাঁচা কলাইয়ের ডাল ও ওলের টক খাইয়া হারাঠাকুর বেতস বৃক্ষের মত পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাত্রি গভীর হইলে রান্নাঘরের মেঝেতে কয়েকটি তালপাতার চাটাই বিছাইয়া উনানের ধারে বিড়ালের মতোই বক্ষোদেশে মস্তক গুঁজিয়া কড়ামিঠে উষ্ণতায় গভীর নিদ্রায় সারা রাত্রি আচ্ছন্ন থাকিয়া অতিপ্রত্যুষেই হারাঠাকুর শয্যা ত্যাগ করিলেন।

পথে বাহির হওয়ামাত্র সারীখুড়ির সঙ্গে দেখা। 'বলি, ও খুড়ি, বিয়েনবেলা যেচো কোথা ?' হারাখ্যাপার সম্ভাষণে সাবী ওরফে ভাতুর মা খেঁকী কুকুরের মতো ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিলেন। 'হাড়ির নেকন আমার, বিয়েনবেলাতেই তোর মুক দেখলাম। যাই আবার, পাদনায় ধান ভিজেনো আছে।' বলিয়া ত্রস্তপদে সাবীখুড়ি হারাঠাকুরকে আলগোছে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। হতভম্ব হারাঠাকুর আ-নিতম্ব চুলের জটা ছাড়াইতে ছাড়াইতে মনে মনে কোন্ গৃহস্থের কুলুঙ্গিতে

নারিকেল তেলের শিশি আছে তাহা ভাবিতে ভাবিতে সাহানা পুকুরের পূর্বপ্রান্তস্থ স্বীয় জীর্ণ কুটিরের উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন।

পথিমধ্যে রামঠাকুরের দোকান দেখিয়া ধূমপানের বাসনা তীব্র হইয়া উঠিল। স্বগৃহ দূরবর্তী অনুমিত হওয়ায় উহা স্থগিত রাখিয়া রামঠাকুরের দোকানের চৌকাঠের পাশে বসিয়া পড়িলেন।

ক্রমে সকাল গড়াইয়া দুপুর আসিল। রাখালেরা গরুর পাল লইয়া মাঠে চলিল। বদি মোড়লের নাতনি অরু, ভাদু মাঠে বাবার জন্য জাম-বাটিতে মুড়ি ও পিতলের ঘটিতে জল লইয়া চলিয়া গেল। পর্যায়ক্রমে সাতটি আসেঁকা বিড়ি পরম তাচ্ছিল্যে দগ্ধ করিয়া যখন হারাঠাকুর পথে নামিলেন তখন তাহার হাত পোড়াইয়া রন্ধনের বাসনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। আড়িমুড়ি ভাঙিয়া আঙুলের গিঁট ফুটাইয়া সাবীখুড়ির বাড়ির দিকেই যাওয়া সাব্যস্ত করিয়া অলস চরণে ঠাকুর অগ্রসর হইলেন।

সকালের মেজাজের লেশমাত্র নাই. ফাটা ফুটির মতো একগাল হাসিয়া সাবীঠাকরুণ হারাঠাকুরকে আহ্বান করিলেন। খুড়ির ভাবান্তরে বিস্মিত ঠাকুর অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

'কিরে খ্যাপাঠাকুর খেয়েছিস?' রুগ্ন ঘোটকীর মতো হাসিয়া সাবীঠাকরুণ হারাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃতজ্ঞতায় গলিয়া যথাসাধ্য মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দিল হারাখ্যাপা, 'খুড়ি তু আমার মা, তু থাকতে পাত পাড়ব কার বাড়ি বল।' অতঃপর খ্যাপাঠাকুর বোষ্টমার জলে স্নান করিয়া পাতা পাড়িয়া সাবীখুড়ির হেঁশেলে খাইতে বসিলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া রাত্রের আহারটুকু একই সঙ্গে সারিয়া লইতে কসুর করিলেন না। আহারান্তে ব্রাহ্মণসেবার সবিশেষ পুণ্যলাভের কাহিনী শোনাইতে শুরু করিলেন। কাহিনীর প্রভাবে সাবীখুড়ির ঢুল আসিতেছিল, ঘুমঘুম চোখে একসময় সাবীখুড়ি বলিল 'হা রে খ্যাপা, বিয়ে করবি?' কথাটি রোমন্থক হারাঠাকুরের কর্ণে ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পেটের ভিতর পূর্ণগর্ভা ইনি সাপের মতো কিলবিল করিয়া নড়িয়া উঠিল। পরমুহূর্তে চালিতে আঁকা

ভৃঙ্গীর মতো স্থাণুবৎ বসিয়া রইলেন। বিবাহের কথা শুনিয়া কুলীন হারাঠাকুরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি বৃদ্ধের দাঁতের মতো অসাড় হইয়া এলাইয়া পড়িল। শুষ্ক-তালু প্রৌঢ় জিহ্বার দ্বারা ভিজাইয়া লইয়া ঠাকুর কোনোক্রমে বলিয়া উঠিলেন, 'খুড়ি আমার বিয়ে হবে!' সাবীখুড়ি মুচকি হাসিয়া চুনদোক্তা ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজিয়া পিক্ ফেলিলেন, ঠাকুর ঘি-খাওয়া লোমওঠা কুক্কুরীর মতো অসহিষ্ণু লালসায় সাবীঠাকরুণের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। 'হা রে খ্যাপা, জমি পাঁচ বিঘে বউয়ের নামে লিখে দিবি ত?' হাবাখ্যাপা খুড়ির প্রস্তাবে আনন্দে গদগদ হইয়া অবলীলাক্রমে মাথা দোলাইয়া উত্তর দিলেন, 'কবে দলিল করে লিবি বল?'

'ও লো ও নমিতা, একবার নেমে আয় ত।' খুড়ির ডাকে খোড়ো বাড়ির সিঁড়ি ভাঙিয়া চতুর্দশী কিশোরী নমিতা নামিয়া আসিয়া অবনত মুখে দাঁড়াইল, ছুঁই মাছের মতন গড়ন, ঘন কালো এক পিঠ চুল, সম্মুখের দাঁতগুলি ঈষৎ উঁচু, রঙ শ্যাম উজ্জ্বল।

তীক্ষ্ম দারিদ্র্য ও তীব্র গঞ্জিকার নেশায় বৎসর দুই পূর্বে নমিতার পিতা গোলক রায় স্বর্ণজোলে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ওরা মায়ে-ঝিয়ে ভিক্ষা করে। মায়ের কাছে শেখা দিশিস্থুরের কীর্তন নমিতার কণ্ঠে কল্লোলিত হয়। ভিক্ষা-ঝুলি ইদানিং দ্রুত পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

বাধ সাধিল নমির কণ্ঠ, ইদানীং গ্রামাঞ্চলে যাত্রাদলের চাহিদা বাড়িয়াছে দর্শকের, আগেকার লাঙলের মুঠি ধরায় অভ্যস্ত শিরা-লাঞ্ছিত হস্তে শচীদেবী অর্ধদগ্ধ বিড়ি কর্ণে গুঁজিয়া, ঠোঁটে আলতা মাখাইয়া যাত্রা আসরে অবতীর্ণ হয় না। অনতিবিলম্বে নমিতা যাত্রাদলে স্থান লাভ করিল।

যাত্রাদলে থাকাকালীন নমিতাদের বড় একটা অভাব ছিল না; কিশোরী কণ্ঠের গানে অনেকের মনে অনেক অবুঝ বাসনা জাগিয়া উঠিত। কিন্তু যাত্রাদলের ম্যানেজার দুকড়ি গড়াই যেদিন রিমঝিম কামরাঙা সন্ধ্যায়, চোলাই মদের সুঘ্রাণ পানের আড়ালে লুকাইয়া

নাতনীস্নেহে নমিতাকে এরূপ আদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাহার ফলে পরদিন হইতেই নমিতাদের তুকড়ি গড়াইয়েব ভাত-ভিটে ত্যাগ করিয়া পথে নামিতে হইয়াছিল।

সাবীঠাকরুণ উদ্ধারণপুরের গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে মতিসায়রের কালীতলা হইতে নিরাশ্রয় নমিতাকে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন।

ইতিপূর্বেই নমিতার মা স্বকন্যা ক্ষুধায় ক্ষীণ হইয়া পুনবায় স্বর্ণজোলের শ্বশুরের বাস্তুভিটায় ফিরিয়া গিয়াছিল। উপায়ন্তরহীন নমিতা সাওতার যাত্রাদলে নাম লিখাইবার জন্য দলের মূল গায়েন পরাণ দাসের সঙ্গে পা বাড়াইয়া নান্নুরের মাঠে পড়িতেই গায়েনমশায় আদি-নামতা গুনিতে শুরু করিলেন—নমিতার সারা অঙ্গ বমি বমি করিয়া উঠিল—কালীতলায় বসিয়া পড়িয়াই বমি করিতে শুরু করিল। যাত্রাদলের বিবেক পরাণ দাস নমিতাকে মা কালীব হেপাজতে রাখিয়া কাটিয়া পড়িয়াছিল!

বয়স অল্প হইলেও নমিতার আঁটসাঁট গড়ন, সাবীঠাকরুণেব নাতিপুতিদের খাওয়ানো-পরানো, ধোয়াপোঁছার কাজ দ্রুত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। আহা! ব্রাহ্মণের মেয়ে, কত কষ্ট—তুবেলা তুটো ভাত, পরণে একজোড়া কাপড়। এ না দিয়া দয়ার-শরীর সাবীঠাকরুণ কি থাকিতে পারেন!

নমিতার দিন কাটে। ঝুঝকি বেলায় কলুপুকুরে স্নান, হাঁড়ি হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করা, বাটনা বাটা, জল তোলা, ঠাকরুণের চুল বাঁধা, এ এমন আর বেশি কি? নমিতার স্বাস্থ্য ফিরিতে লাগিল, কিন্তু ইদানীং সাবীখুড়ি কানাঘুষায় শুনিতে পাইয়াছেন আইবুড়ো বামুনের মেয়ে বাড়িতে পোষা মোটেই নিরাপদ নয়। অথচ নমিতা চলিয়া গেলে সংসারের হাল কি হইবে? যেমন করিয়া হউক নমিতাকে গাঁয়ে রাখিতেই হইবে। দীর্ঘকাল ভাবনা-চিন্তা করিয়া সাবীঠাকরুণ পাঁচ বিঘা জমির মধ্যস্বত্বের মালিক কুলীনকুলসর্বস্ব হারাঠাকুরের শূন্যকণ্ঠে নমিতাকে ঝোলাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

এতক্ষণ নমিতা কাপড়ের খুঁট চিবাইতে চিবাইতে চৌকাঠের কাছে বুড়ো আঙুল দিয়া মাটির চটা ছাড়াইতেছিল। গরম জিলাপী খাইলে যেরূপ মুখাকৃতি হয় অনুরূপ মুখভঙ্গি করিয়া পিচুটি-চোখে হারাঠাকুর নমিতার সর্বাঙ্গ লেহন করিতে লাগলেন। সাবীখুড়ি চোখ মটকাইয়া হাসিয়া কহিলেন—'কি রে খ্যাপাঠাকুর, পছন্দ হয়েছে ?' উত্তরে হারাঠাকুর ভূতকুমড়োর মত সাবা মুখ এলাইয়া দিয়া কহিলেন—'হুঁ'।

কৃষ্ণকায় শ্যাওলা-পড়া সহিষ্ণু দাঁতগুলির পাশে পুঁজোলো অন্ধকার দানা বাঁধিয়াছে। বিচ্ছিন্ন দু-চারিটি দাঁত হতশ্রী হাড়গিলে পাখির মতো দাঁড়াইয়া আছে, মুখের পচা-ভাপসা গন্ধে সাবীঠাকরুণ মুখে আঁচল দিয়া সরিয়া বসিয়া হারাকে বিয়ের জোগাড় করিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। বিদায়ের কালে বিহ্বল দুষ্মন্তেব কাছা খুলিয়া পড়িল। কাছা গুঁজিবার বদলে পৈতাটি কানে গুঁজিতে গুঁজিতে হারাঠাকুর খুড়ির বাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ক্রমে মাঠে-ঘাটে মোড়ল মোল্যানদের মুখে মুখে সরস্বতী ও ভোলাদাসী ঠাকরুণদের গেজেটের গুণে এ সংবাদ একদিন বৈষ্ণব গোপীনাথের—বর্তমানে মুসলমান ফকিরের ভক্ত—তক্তিবাঁধা, কানে গিয়া পৌঁছাইল।

ইদানীং গোপীনাথ সাধুসন্ত ও ফকিরদের সহিত সংগত করিয়া বুঝিয়াছে সংসারধর্ম পালন করিয়াই সংসারের মোহ ভঙ্গ করিতে হয়, অন্যথায় সাধনজ্ঞানে আসক্তি জন্মে না, সিদ্ধিলাভ হয় না। পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়া সাধক গোপীনাথের মন অকারণে চঞ্চল হইয়া উঠে। পুকুরঘাটে বিশেষ দু-একটি সময়ে গোপীনাথকে পূজার জন্য বিল্বপত্র সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত দেখা যায়।

হারাঠাকুরের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া গোপীনাথ পিতৃদেবের ধোলাই-ধুতি মালকোঁচা মারিয়া পরিয়া একদিন সাবীখুড়ির গৃহাঙ্গণে উপস্থিত হইল এবং উপযাচক হইয়া তুলসীমঞ্চে হরিভজনা শুরু করিয়া দিল। সাবীঠাকরুণ মুচকি হাসিয়া ভক্ত গোপীনাথকে দিয়া একপাল গরুবাছুরের জন্য ছানি কাটাইয়া লইলেন। অতঃপর দুই ঠাকুরের

পদধূলিতে সাবীঠাকরুণের অঙ্গন ভরিয়া উঠিল, সাবীখুড়ি গায়ে ফুঁ দিয়া পাড়া বেড়াইতে লাগিলেন! হাট-ঘাট দোকান-পাট করে হারাঠাকুর, গোধনের সেবায় নিযুক্ত সাধক গোপীনাথ, হেঁশেলের দায়িত্ব সম্পূর্ণ নমিতার।

মাঝে মাঝে দুই ঠাকুরের ঠকঠকানি, টক্‌ঝক, চুলোচুলি দেখিয়া নমিতার হাসি পায়! একচোখে হারাঠাকুরের দিকে হাসিয়া পরমুহূর্তে গোপীনাথকে ঠাণ্ডা জল গড়াইয়া দেয়। হারাঠাকুরের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া ওঠে, গোসাপের মতো রাগে তার গা গর্ গর্ করিতে থাকে। নমিতার চাল-চলন, ঢং-ঢাং রঙ-তামাশা তাহার মোটেই ভালো লাগে না। অবিলম্বে বিবাহ প্রয়োজন। হারাঠাকুর ক্রমাগত সাবীঠাকরুণকে তাড়া দিতে থাকে। ইতিমধ্যে হারাঠাকুর ডাঙাপাড়ার হাল-বোষ্টম কৌপিন-খেঁচা গোষ্ঠ মুখুজ্জের নিকট তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা,' মনুর এ বাণীটুকু অসময়ে বড়ই উপকারে আসিয়াছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী গোপীনাথের বরাত বড়ই মন্দ, বিষয়সম্পত্তিহীন নাবালক গোপীনাথ নমিতার বিবাহের তালিকা হইতে ছাঁটাই হইয়া গেল। নমিতার নামে পাঁচবিঘা জমি দলিল করিয়া লিখিয়া দিবার অঙ্গীকার করিলে হারাঠাকুরের বিবাহের সম্ভাবনা পাকা হইল। বিবাহের উত্তেজনায় জৈষ্ঠের ভেকের মতো হারাঠাকুরের হৃদয় কলরব করিতে চাহিল। কিন্তু কয়েকটি ক্লান্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তেজনা ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিল।

দারপরিগ্রহের অভিজ্ঞতা হারাঠাকুরের নতুন নয়। তিলপাত্রমতে মন্দ হইবে না। নরসুন্দর কংসারীকে পুরাতন ফতুয়াটি দান করিলে কি কেশপাশ মুক্ত হইয়া একটি তৃতীয় পক্ষের বরের মুখ ভাসিয়া উঠিবে না! প্রথম পক্ষের শাশুড়ী ঠাকুরাণী তালের বড়া ভাজিতে ভাজিতে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন হারাঠাকুরের কর্ণে তাহা আজ থাকিয়া থাকিয়া কুন্তেশ্বরীর পায়ের নূপুরের মতো বাজিতে থাকে, "হারাধনের কি যে গড়ন—টানা টানা ঢুলুঢুলু চোখ, তালপাতার মতো

ধারালো নাক, আর কি মিষ্টি মোলায়েম কথা বলে।” কপাল মন্দ, প্রথমা পত্নী কুন্তেশ্বরী কালাজ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন, হারাঠাকুরকে কি ভালোই না বাসিতেন।

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়িতেছে, শ্বশুরালয়ে শীতলপাটিতে শুইয়া কুন্তেশ্বরীর জন্য হারাঠাকুর আন্‌চান করিতেছেন। নিঃশব্দে এক আঁচল গরম গরম তালের বড়া লইয়া আসিয়া কুন্তেশ্বরী তাহার মুখে পুরিয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। অসময়ে হারাঠাকুরের দেহ শিরশির্ করিয়া উঠিল! তালের বড়ার সৌরভে ঠাকুরের জিহ্বা চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং যাঁতাকলে ইঁদুরের মতো জিহ্বাটি অসাড় হইয়া এক ভগ্ন দন্তগহ্বরে কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া রহিল।

হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। গাঙ্গুলীকে এক কথা বলিয়া আসিতে হইবে। নির্জন কর্দমাক্ত গ্রাম্যপথে অন্ধকার জোঁকের মত চাপিয়া বসিতেছে, একটি কাঁচা বিড়ি ধরাইয়া রসুনের রসে জোড়া দেওয়া কাঁচের হ্যারিকেনটি ধরাইয়া হারাঠাকুর নমিতার বিবাহের পুরোহিতের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। শ্রীপদযুগল স্থির থাকিতেছে না। প্রাণপণে ত্রস্ত বিড়ালের মতো খামচাইয়া নরম মাটিতে চলিবার চেষ্টা করিয়া ঠাকুর কেবলই ব্যর্থ হইতে লাগিলেন।

কেবলই যৌবনের কথা মনে পড়িতে লাগিল। একটানা পনের-কুড়ি মাইল হাঁটা কি সহজ সাধ্যই না ছিল। পায়ে সে আঠা আর নাই, হাঁটুটাও নড়বড়ে হইয়া আসিয়াছে, কেবলই এলাইয়া পড়িতে চায়। মাঝে মাঝে নিশ্ছিদ্র হ্যারিকেনটির দম বন্ধ হইয়া আসায় বিপুল পরিমাণে ধুম্র উদ্‌গীরণ করিতে থাকে, এবং ঠাকুরের অস্থির পদচারণায় তাহা দুলিতে দুলিতে ধূম্র ত্যাগ করিতে করিতে একসময় নিভিয়া যায়, মৃত হ্যারিকেনটি ঠক্ করিয়া পথিপার্শ্বস্থ অনিল ময়রার দোকান-পিড়েতে নামাইয়া ঠাকুর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইবার বাসনায় ভিজা কাঠের মতো হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িলেন, তৎক্ষণাৎ ক্লান্তি ব্যাঙের মতো লাফ মারিয়া ঠাকুরের কোল জুড়িয়া

বসিল। হাই তুলিয়া আঙুলের তুড়ি দিয়া একাদশী চাঁদের দিকে মুখ করিয়া হারাঠাকুর শুইয়া পড়িলেন।

উনুনের ধারে কুণ্ডলি পাকাইয়া পড়িয়া থাকা অনিল ময়রার কুকুরটি নিদ্রাবিঘ্নিত চক্ষে একবার ঠাকুরের শয়ান লক্ষ্য করিয়া মৃদু লেজ নাড়িয়া পুনরায় ঘুমের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিল।

ঠাকুরের নাসিকাগর্জন, ঝিঁঝিঁর ডাক, বৃষ্টির ধারা, কালো মেঘের বুক ফাটিয়া একাদশী চাঁদের হাসি—সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। সজল জ্যোৎস্নার বন্যায় ভাসিয়া আসিতে লাগিল শিহরিত কদম্ব ফুলের পুলকিত সুবাস। জ্যোৎস্নালোকে মমির মত হারাঠাকুরের নিদ্রিত মুখে হাসি ফুটিল—গুম্ফের কিয়দংশ শ্রাবণী সমীরণে পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ; লালাসিক্ত বদনে চুক্ চুক্ ধ্বনি করিয়া ঠাকুর কি যেন অস্পষ্টভাবে বলিতে থাকিলেন— 'ঐ ত কুণ্ডেশ্বরী, চাঁদের আলোয় সায়রের তেঁতুলতলায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। এমন শুভ্র হাসি সে কখনো হাসে নাই, গুটি গুটি পায়ে ঠাকুর আগাইয়া চলিলেন। তেঁতুলগাছের শিকড়ে বসিয়া কুণ্ডেশ্বরী হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে তালের বড়া খাওয়াইয়া দিতেছে। সায়রের ঘাটের কালো জলে চাঁদ মুখ দেখিতেছে। সে দিকে তাকাইয়া আনন্দে হারাঠাকুরের মন জোনাকির মতো নাচিতে লাগিল। হঠাৎ জলের বুক দুলিয়া উঠিল, একমাথা কাঁচা কালো চুল লইয়া পানকৌড়ির মতো লাল শাঁখা হাতে ভস্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল সরলা—ঠাকুরের দ্বিতীয় পত্নী। বোবামুখে প্রকট চোখে তাকাইয়া ঠাকুরকে হাত বাড়াইয়া সে যেন আমন্ত্রণ জানাইতেছে। আতঙ্কে কণ্ঠাগতপ্রাণ ঠাকুর কুণ্ডেশ্বরীর কোলে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন।

কপাল ঠোকা গোঙানিতে অনিলের কুকুরটি হারাঠাকুরের কানের কাছে ভুক্ ভুক্ করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। উহাতে কাজ হইল, উদরী রোগীর মতো পিছনের দুই হাতে ভর করিয়া ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন, দুই কশ গড়াইয়া লালা পড়িতেছে, ভয়বিহ্বল নেত্রে শূন্য দৃষ্টি, আহত, রক্তাক্ত ললাটে ধানি লঙ্কার জ্বালা। একাদশীর

পাণ্ডুর চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, এমতাবস্থায় খালি পেটে ঢেকুর তুলিয়া বায়ু নিঃসরণপূর্বক নির্বাপিত জীর্ণ হ্যারিকেনটি হাতে লইয়া ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুণ্ডেশ্বরীর হাসি ছাপাইয়া সরলার মৃত মুখ ভাসিয়া উঠিল। সন্তরণে অপটুতাই কি সরলার মৃত্যুর কারণ? না আত্মহত্যা? হারাঠাকুরের সন্দেহ নিরসন এখনো হয় নাই।

জলমগ্ন সরলার মৃতদেহ যখন উদ্ধার করা হয়, সে সময় জন্ম-মূক সরলার প্রকট চাহনি ভাবিতে গিয়া হারাঠাকুরের কম্পিত কলেবরে পদ্মকাঁটা দেখা দিল। মনের মধ্যে কি যেন একটা আতঙ্ক ডাঁশ মাছির মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই হুল ফোটাইতে লাগিল। কোনোক্রমে গাঙ্গুলীদের কালীতলা পর্যন্ত স্বীয় ধড়টি ক্লান্ত ধাঙ্গড়ের মতো ঠেলিয়া লইয়া গিয়া বেদিমূলে যূপকাষ্ঠে মেষের মতো স্থাপিত করিল। সারা অঙ্গ কুঁকড়াইয়া আসিতেছে, কর্ণশীর্ষস্থ শুভ্র লোমগুলি শরতের কাশফুলের মতো কাঁপিতেছে। নিরুপায় ঠাকুর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বিভীষিকার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিলেন। অবরুদ্ধ ক্রন্দন ঠাকুরের দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠদ্বয়ের যবনিকা ভেদ করিয়া বাহির হইল—'গাং-গুউউলী'।

রাত্রিশেষে কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হইয়া আসায় কোঠার উপরে গাঙ্গুলীমশায় উবু হইয়া বসিয়া আত্মারামকে খাঁচায় আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। ইতিমধ্যে বেদি হইতে উৎসারিত এই ক্রন্দিত আহ্বান তাহাকে যথাস্থানে স্থির থাকিতে দিল না। অনুমানে সিঁড়ির গতিবিধি নিরূপণ করিয়া অতি সন্তর্পণে কোঠা হইতে নামিয়া আসিয়া বেদিমুলে ভূলুণ্ঠিত হারাঠাকুরকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। শ্রাবণধারায় অভিষিক্ত হারাঠাকুরকে তুলিয়া বাম হস্ত বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া গাঙ্গুলীমশায় সস্নেহে কহিলেন—'কি রে খ্যাপা, মায়ের থানে এলি কি করে?' অতিকষ্টে দুই হস্তে চক্ষের জল গণ্ডদেশে লেপন করিয়া হারাঠাকুর কচি শালিক কণ্ঠে কহিল—'খুড়ো, আমার বিয়ে।' উত্তর শুনিয়া গাঙ্গুলী-

মশায় পরম বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। মায়ের বেদিমূলে সৃষ্টির এ কি আকুল ক্রন্দন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতে হারাঠাকুরের সামগ্রিক অভিব্যক্তি সন্দর্শনে প্রচণ্ড হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন। উহাই কাল হইল। হাসি বক্ষোদেশের কফের চালিকাশক্তি হইয়া প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি করিল। গাঙ্গুলীমশায়ের কোঠরাগত অক্ষিদ্বয় জলে ডুবিয়া গেল, নাসিকাদ্বয় হইতে সিকনি-স্রোত পীতবর্ণ শোভার ন্যায় বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। সযত্নে বাম হস্তে পঞ্জরপক্ষিণীর পাখার ঝাপ্টানি সামলাইয়া কহিলেন, 'বিয়ে? তা কাঁদছিস' কেন?

ক্রন্দনে ঠাকুরের তালুদেশ শুকাইয়া গিয়াছিল, কয়েকবার শুষ্ক ল্যাঠা মাছের মতো ক্লান্ত জিহ্বাটি তালুতে লেহন করিয়া আড়ষ্ট নেত্রদ্বয় তুলিয়া কহিল—'খুড়ো, একঘটি জল।' কায়ক্লেশে গাঙ্গুলীমশায়ের ঘরে পৌঁছাইয়া রাত্রির শেষ যামে একলোটা জল পান করিয়া ঠাকুরের ধাত যথাস্থানে ফিরিয়া আসিতেই কহিলেন—'খুড়ো, যা বলছিলাম, বিয়ে তোমাকেই দিতে হবে। মেয়েটার মা বাপ নাই, আমাদেরই মতো অনাথ, কে আর সম্প্রদান করবে বল? সম্প্রদান তোমাকেই করতে হবে খুড়ো, না বললে চলবে না, না, না···বাবা এ ধর তোমার নিজেরই···ও-সব কিছু ভেবো না খুড়ো, টাকা সাতেক খরচ করব বৈকি, ও-সব গামছা সি দুর তুমিই লিয়ে যেয়ো।'

মন্ত্রমুগ্ধ গাঙ্গুলীমশায় পেশাদারী দর-কষাকষি করিলেন না। হারাঠাকুরের পিতৃত্ব লাভের অফুরন্ত বাসনা, বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আদি-অন্তহীন বাসনা, অপুত্রক গাঙ্গুলীমশায়ের হৃদয়ে এক অপরূপ কুজ্‌ঝটিকা সৃষ্টি করিল; বিস্ফারিত নেত্রে সেই কুজ্‌ঝটিকাকে ভেদ করিয়া শ্রীঠাকুরের মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকাইয়া রহিলেন। কথা নিভিয়া আসিল, বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়া ঠাকুর পুনরায় নিদ্রিত হইলেন। ঘুমের ঘোরে মস্তক কেবলই হেলিয়া পড়িতেছে, টিকি নড়িতেছে, দাড়ি উড়িতেছে।

ক্রমে ভোর হইল, লাঙলহাটার বিলের ঝলমলে জলের ঢেউ ভাঙিয়া উঠিলেন সূর্যদেব। নিশিক্লান্ত ঠাকুর শয্যা ত্যাগ করিয়া

গাঙ্গুলীখুড়োর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ বাদাম তেল লইয়া মস্তকে ঘর্ষণ-পূর্বক বিলের পাশে রায়ের পুকুরের নির্জন ভগ্ন বাঁধানো ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাল যুগের বাঁধানো ঘাটের ফাটলে প্রাচীন পাকুড় গাছটি আজও দাঁড়াইয়া আছে। হারাঠাকুর বাম করপুটে গণ্ডদেশ রক্ষা করিয়া ঘাটে বসিয়া, বুদ্ধের করুণ মূর্তির মতো শোভা পাইতে লাগিলেন।

স্বল্পদৃষ্ট বোবা বউয়ের চাহনি থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের মতো ঠাকুরের অন্তঃকরণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল। উড়ু উড়ু শীতল বাতাস বহিতেছে, আতঙ্কিত ঠাকুরের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া প্রতি লোমকূপে পদ্মকাঁটাগুলি শজারুর কাঁটার মতো সোজা হইয়া দাঁড়াইল! আত্মরক্ষার্থে রামনাম জপ করিয়া ঠাকুর ঘাটের সিঁড়ি ভাঙিয়া ঘাটের শেষ ধাপে উপস্থিত হইলেন এবং ক্লান্ত গাভীর ন্যায় জলের ধারে ঝুঁকিয়া তৈলসিক্ত অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিতে লাগিলেন। অবাক জলপানে উদর স্ফীত হওয়ায় ভারসাম্য লঙ্ঘিত হইল। ঠাকুর সরাসরি জলমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন।

শীতল জলে অঙ্গ জুড়াইয়া বামহস্তে নাসিকা-ছিদ্র আবদ্ধ করিয়া চড়ুই পাখির মত টুক করিয়া ডুব দিয়া মুখ তুলিয়া ঠাকুর দেখিলেন, সূর্যদেব বিলের বুক ছাড়াইয়া অনেকখানি ওপরে উঠিয়াছেন। বিড় বিড় করিয়া জবাকুসুম ধ্বনি দিয়া সূর্য প্রণাম করিতে গিয়া দেখিলেন —হাস্যময় সূর্যের আদলে ঠাকুরের পিতৃদেব ৺নিকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের মুখ শোভা পাইতেছে। পিতৃদেবের হাস্যময় মুখদর্শনে উৎসাহিত বোধ করিয়া হারাঠাকুর মনে মনে তৃতীয় বার দারপরিগ্রহের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। দিব্যজ্যোতি চর্মচক্ষে সহ্য হইল না— ঠাকুরের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া ঈষৎ টলিয়া গেল। ঠাকুর পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

গা ঝাড়া দিয়া পুকুরঘাট হইতে উঠিয়া সিক্তবসনে সরাসরি সাবীখুড়ির বাড়িতে আসিয়া উৎফুল্লমনে সাবীঠাকরুণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—'খুড়ি একখানা কাপড় দে, কোনো চিন্তা নাই, সব

পাকা, গাঙ্গুলী সম্প্রদান করবে।' বলিতে বলিতে খুড়ির দেওয়া থান কাপড়টি কোমরে জড়াইয়া ভিতরেরটি ছাড়িতে যাইবেন—এমন সময় কেঁউটে সাপের ড্যাকার উদ্ধত ছোবল দেখিয়া বৃদ্ধ বেদে যেরূপ চমকিয়া ওঠে নমিতার দিকে চোখ পড়ায় অনুরূপভাবে চমকিত হইয়া ভিজা কাপড়ের ওপরেই গিঁট বাঁধিয়া সন্ত্রাসে কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে হারাঠাকুর স্বগৃহে গমন করিলেন যাইবার কালে সাবীখুড়ির উদ্দেশে সফল বিবাহের সম্ভাবনার কথা পুনরায় ঘোষণা করিতে ছাড়িলেন না।

সাতাশে শ্রাবণ, বিবাহলগ্নে পূর্ণিমা। পুরোহিত গাঙ্গুলীমশায় সন্ধ্যা হইতেই আসিয়া হারাঠাকুরের ভিটেয় বসিয়া ভাবিতেছেন—'কাকস্য পরিবেদনা।' লোকজনের মুখ দেখা যায় না। চাঁদের আলোয় শিবাকুল সম্মুখের সাহানার জঙ্গলে ঘুরিয়া ফিরিয়া ডাকিতেছে। লগ্ন বহিয়া যায়, এক সময় ঊরুপরি মশক দংশনে চপেটাঘাত করিয়া গাঙ্গুলীমশায়ের কণ্ঠে জাগিয়া উঠিল, 'বাবা কংসারি, আমার তো ঢুল আসছে বাবা, হারাকে বলিস—কাল বিয়েন-বেলাতেই বিয়ে-কুসুমডিঙে তুইই সেরে লোব!' প্রত্যুত্তরে কংসারি নাপিত কাতর উক্তি করিয়া উঠিল। গাঙ্গুলীমশায়ের পাশে শুইয়া থাকা কংসারি নাপিতের গালেই ঠাকুরের চপেটাঘাতটি পড়িয়াছিল। ইদানীং জল বসিয়া কশের মাড়িসুদ্ধ দাঁতগুলি ফুলিয়াছিল, চপেটাঘাতে আহত দন্তরাজি যন্ত্রণায় মড়মড় করিয়া উঠিল। সন্তর্পণে দন্তগুলি জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে করিতে অস্পষ্ট ধ্বনি সহযোগে কংসারি নাপিত গাঙ্গুলীমশায়কে লাঞ্ছিত করিতে লাগিল।

বাবু সাহার বাড়িতে সদ্য মদ্যপানে তৃপ্ত হইয়া হেঁড়ে গলায় গান ধরিয়া পাতু মুখুজ্জে বাড়ি ফিরিতেছিল নির্জন বাড়িতে হঠাৎ কাতরোক্তি শুনিয়া তাহার রসভঙ্গ হইল। ঘরের চালায় গাঙ্গুলী-মশায় ও কংসারিকে আবিষ্কার করিয়া মাতাল পাতুর কৌতুক বাঁধ ভাঙিয়া আছড়াইয়া পড়িল। অঘ্রাণ মাসের খটাশের মতো খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে কংসারির পাশে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া গান জুড়িয়া দিল।

'মরা গাব্ গাছে কোকিল ডেকেছে
টিয়ে ময়না পাত্তা পায় না
মজা মেলে ক্যাঁচক্যাঁচে।'

পড়শি যতীন মোড়লের রান্নাঘরে কাঁচা কুমড়োর তরকারিতে কাঁচা লঙ্কা রসুনের ছ্যাক পড়িল। গাঙ্গুলীমশায় কাশিতে লাগিলেন।

কাশি তীব্রতর হইল। চক্ষুদ্বয় কপালে উঠিল। কংসারি আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল। এমন সময় উষাং মোল্যানকে হন্তদন্ত হইয়া ঢুকিতে দেখা গেল। বেগতিক দেখিয়া দ্রুত পায়ে পুকুরঘাটে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া গাঙ্গুলীমশায়ের চোখেমুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

সপাত্র সাবীঠাকরুণ সদ্য রসকলি আঁকিয়া কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করিয়া একটি মলিন বেনারসী হস্তে গাঙ্গুলীমশায়েয় শিয়রে আসিয়া ভয়ে থরহরি কাঁপিতে লাগিল।

সিক্তবস্ত্র উপবীত কণ্ঠে পাত্ররূপী হারাঠাকুর গঙ্গাফড়িংয়ের মতো হাঁটু ভাঙিয়া গাঙ্গুলীখুড়োর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। ব্যাপার-স্যাপার দেখিয়া মাতাল পাতু খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উষাং মোল্যানের তেলজলের মালিশে গাঙ্গুলীমশায়ের শ্বাসবায়ু নিম্নগামী হইল। শিবনেত্রদ্বয় যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। ইহার পর বার দুই কাশির মাঝে মাঝে আন্দাজ দুশ গ্রাম রসে-কফে তুলিয়া গাঙ্গুলীমশায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বিবাহে উদ্যোগী হইতে নির্দেশ দিলেন।

সাবীখুড়ি ও উষাং মোল্যান চ্যাংদোলা করিয়া লইয়া গিয়া হারাঠাকুরকে কাপড় ছাড়াইতে গেল।

কংসারি একটি বিড়ি ধরাইয়া বিবাহের আয়োজনে তৎপর হইল। যতীন মোড়লের বাড়ি হইতে এক হাতা তুষের ছাই আনিয়া ছাতনা-তলার চতুঃসীমা, যজ্ঞস্থল ও ঘট স্থাপনের নির্দেশক চিহ্ন অঙ্কিত করিল। সপত্র কাঁচা কঞ্চি আনিয়া চালার খুঁটিতে বাঁধিয়া দিল। অতঃপর দুইটি হেঁশেলঘরের পিঁড়ি ভিজা মাটির ওপর থপ্ থপ্

করিয়া পাতিয়া দিয়া গাঙ্গুলীমশায়কে আসন গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইল।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। সাহানাপুকুরের শিবাকুল দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করিল। আশেপাশের গাছপালায় বাদুড়ের পাখা ঝাপ্‌টানি, প্যাঁচার চিৎকার শোনা যায়।

হঠাৎ পাতু নেশার ঝোঁকে খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া হাসিয়া গাঙ্গুলী-মশায়ের পাঁজরে কাতুকুতু দিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল—'ওঠো বাবা পটকা-মারা ড্রাইভার। শ্যাল যে ডেকে গেল।'

বিবাহমণ্ডপের চালের বাতায় রস্থনঝালাই হ্যারিকেনটি খ্যাপা শেয়ালের চোখের মতো জ্বলিতেছে।

নিঃশব্দে সাবীখুড়িকে অনুসবণ করিয়া ব্রাহ্মণকন্যা নমিতা নির্ধারিত পিঁড়িব ওপর ধনুকের ছিলার মতো দাঁড়াইয়া পড়িল। পরনে জীর্ণ লালপেড়ে বেনারসী শাড়ি, চুলগুলি কানের পাশ হইতে টানটান করিয়া তুলিয়া লইয়া মাথায় কুণ্ডলী কবিয়া বাঁধা। রগের শিরাগুলি দপ্‌ দপ্‌ করিতেছে। কুশনয়না নমিতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি জননী বসুন্ধরাকে বিদ্ধ করিতেছে।

নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া মলিন মট্‌কা কাপড়ের খুঁটে বার দুই চোখ মুছিয়া সাবীঠাকরুণ নমিতার স্বর্গীয় পিতামাতার উদ্দেশে বলিয়া উঠিলেন, 'ভাঙাকুলো হয়ে আর কতকাল থাকব। তোমাদেরই ত সম্প্রদান করবার কথা, জানি না আমার নেকনে আর কত কি আছে! কই গো গাঙ্গুলী, কনে পিঁড়িতে বসাব?'

প্রত্যুত্তরে গাঙ্গুলীমশায় হারাঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'কই গো বাবাজী ইদিকে এসো, বিয়ে কুসুমডিঙে রেতে রেতেই সেরে দেব।' উত্তর দিল কংসারি—'তা আর কথা আছে, চার হাত এক করা নিয়ে কথা, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। গায়ত্রীটা সংক্ষেপে জপ করিয়ে উচ্ছুগ্‌ করে দাও গাঙ্গুলী। কই গো বাবাজী পিঁড়িতে বসো।'

বৃদ্ধমেষসুলভ পদভঙ্গি সহকারে নিঃশব্দে হারাঠাকুর পিঁড়ির উপর

ভর করিলেন। কয়েকদিন একটানা কায়িক পরিশ্রম গিয়াছে। এক দলিল লেখাতেই কামারপাড়ার গজাই মোড়লের বাড়ি তিনবেলা যাতায়াত করিতে হইয়াছে। সর্বাঙ্গে প্রবল যন্ত্রণায় তাহার হাড়ের ছাল যেন ছাড়িয়া পড়িতেছে। ঠাকুরের পূর্বের অস্বাভাবিক আতঙ্কিত চাহনি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টিতে গাঙ্গুলীমশায়কে লক্ষ্য করিয়া বরবেশী হারাঠাকুর কহিলেন, 'সংক্ষেপে সেরে নাও খুড়ো, গতিক সুবিধেব লয়।'

'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ', বলিতে বলিতে গাঙ্গুলীমশায় তৎপর হইয়া উঠিলেন। অতঃপর ভিজা আসনে বসিয়া, সম্মুখে পুঁথিটি রাখিয়া ঘষা-কাঁচের চশমার আড়ালে অপরূপ 'ওঁ'-খচিত কণ্ঠে বিবাহমন্ত্র সংক্ষেপে আবৃত্তি করিয়া সম্প্রদান মন্ত্রে আসিয়া থামিলেন।

শ্রাবণ-রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া সাবীখুড়ি, উষাং মোল্যান উলুধ্বনি দিয়া উঠিল।

মৌতাতের বিঘ্ন ঘটায় চক্ষু মেলিয়া কয়েক মুহূর্তে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম কবিয়া পাতু মুখুজ্জে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। ঝাঁকিয়ে উঠল উষাং মোল্যান, 'বলি মুখুজ্জে, খটাসের মতো হাসবে, না বিয়ের সাতসী ধরবে?' অগত্যা পাতু দেড় ঠ্যাঙে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাটকাঠিব সাতসী জ্বালাইয়া ল্যাংচাইতে ল্যাংচাইতে পাতু মুখুজ্জে বররূপী হারাঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

হঠাৎ মাতাল পাতুর মনে এক নিষ্ঠুর কৌতুক সাপের জিভেব মতো লক্‌লক্ করিয়া উঠিল। জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড ভাঙিয়া হারাঠাকুরেব গালে টিপিয়া ধরিয়া খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

'উঃ হু-হু মলাম রে', বলিয়া পাত্র হারাঠাকুর আত্মরক্ষার্থে কর্তিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় উষাং মোল্যানের বুকের উপর ঢলিয়া পড়িয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন।

'আ মর্ মিন্‌সে, আমাকে ধরছিস কেনে', বলিয়া উষাং মোল্যান হারাঠাকুরকে কাঠের চ্যালার মতো দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড় করাইল। 'কি বাওয়া, একেবারে ছ্যাঁ কলো কলো। কি গো গাঙ্গুলীখুড়ো

ষাঁড় কেমন দেগেছি ?' বলিয়া মাতাল পাতু পুনরায় হাসিতে লাগিল।

কংসারি এই ফাঁকে একজোড়া কদমফুলের মালা লইয়া আসিয়া একটি চিত্রার্পিত হারাঠাকুরের হাতে, অন্যটি নমিতাকে গচ্ছিত করিয়া শুভদৃষ্টি ও মালাবদলের কাজটি সুসম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইল।

সাবীখুড়ি ও উষাং মোল্যানের উলুধ্বনিতে ভেককুল আতঙ্কে নীরব হইল। পাতু চোখ বুজিয়া হাসিতে থাকিল. ক্ষীরের মতো জমাট হলুদ পিচুটিকে আপ্লুত করিয়া পাত্র হারাঠাকুরেব নেত্র হইতে জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

কংসারির সহায়তায় ঠাকুরের হাতের কদমফুলের মালা বধূ নমিতার কণ্ঠে দুলিতে লাগিল।

লাল পেড়ে পুরাতন বেনারসী শাড়িতে মোড়া নমিতার কপালের সিঁদুরের টোপে মেঘভাঙা চাঁদের আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। চোখেব কাজল ঘিরিয়া রাখিয়াছে এক বিষাদসিন্ধুকে ; কণ্ঠলগ্ন কদম-ফুলেব সৌবভে আমোদিত বিবাহবাসর, বামহস্তে কাজললতা—ফাটা কার্পাস ফুলের মত শূন্যদৃষ্টিতে নমিতা একটি কদমফুলের মালা হারাঠাকুরের গলায় পৌঁছাইয়া দেয়।

বরকে জলধারা দিয়া অভ্যর্থনার দায়িত্ব ইতিপূর্বেই শ্রাবণের মেঘমালা সারিয়া রাখিয়াছে।

অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া সাবীঠাকরুণ নববধূ নমিতাকে একমাত্র বাসর ঘরে লইয়া গেলেন এবং একটি তালাই-এব ওপর নমিতাকে শোয়াইয়া একটি জীর্ণ শতরঞ্চে নববধূর আপাদমস্তক আবৃত করিয়া উষাং মোল্যানের উদ্দেশে কহিলেন, 'ও লো ও উষাং, হারাকে ডাক্, গোঁসাঘরের খিল খোলাক।'

সাবীখুড়ির তীক্ষ্ণস্বরে হারাঠাকুরের সম্বিত ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী-আচার পালনার্থ দ্রুত গোঁসাঘরের দিকে পা বাড়াইয়া উষাং মোল্যান কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, ঠাকুর যৎপরোনাস্তি বিরক্তি বোধ করিলেন।

পাকা খেরোর বিচির মতো কালো কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে উষাং মোল্যান কহিল, 'দাঁড়াও খ্যাপাচাঁদ, ধড়ফড়াইছ কিসের লেগে, তুমি ত বাবা বুড়া ডাঁশ, বসবা গিয়ে অসের চাকে, দুয়ার খুলুনিব পাব্বোনিটা দাও ত মিটিয়ে এই ফাঁকে।'

উষাং মোল্যানের এই ধাষ্টামি হারাঠাকুরের অসহ্যবোধ হইল, কিন্তু তাহাকে কাটাইবার বিন্দুমাত্র শক্তি তখন হারাঠাকুরের অবশিষ্ট ছিল না। কোনোক্রমে চড়ুইছানার মতো মৃদুকণ্ঠে হারাঠাকুর কহিলেন, 'দুয়োর ছাড় লো মাগি, গা আমার…এলি…ইয়ে-এ আসছে।'

সন্ত্রস্ত উষাং মোল্যানের রগের শিরা দুটি চাবুকের দাগের মতো দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল।

ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো টাল মারিয়া কোনোক্রমে ঠাকুর বাসরঘরে প্রবেশ করিলেন।

অগ্নিকোণে চোরাকুঠরিতে স্তূপীকৃত ইঁদুরের মাটির উপর একটি লম্ফ মিনি মশালের মতো জ্বলিতেছে, কোমরে হাত দিয়া ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া সাবীঠাকরুণ চিত্রার্পিত মন্থরার মতো একদৃষ্টে হারা-ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আছেন। লম্ফের আলোয় ঠাকরুণের বিরাট ছায়া দেওয়ালে পড়িয়া ভয়ংকর দেখাইতেছে।

কেরোসিন-শিখা সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া গলগল করিয়া চোরকুঠরিতে ঢুকিয়া পড়িতেছে।

গভীর আতঙ্কে হারাঠাকুরের অন্তরাত্মা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরমুহূর্তে…সা…প বলিয়া চিৎকার করিয়া হারাঠাকুর স্থায়ীভাবে ধরাশায়ী হইলেন।

প্রাণভয়ে সাবীখুড়ি 'সাপ গো, মলাম গো' বলিয়া তড়িঘড়ি চৌকাঠ ডিঙাইয়া উঠোনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

'সাপ' শব্দটি গাঙ্গুলীমশায়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র, লাফাইয়া উঠিতে গিয়া কোমরে খেঁচকি লাগাইয়া—ন ঊর্ধ ন অধঃ

অবস্থায় কাতরোক্তি করিয়া কংসারীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যন্ত্রণায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে কংসারির কাঁধে ভর করিয়া উঠোন টপকাইয়া গাঙ্গুলীমশায় প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। চালাঘরের অন্ধকার হইতে ভয়ার্তকণ্ঠে উষাং মোল্যান জিজ্ঞাসা করিল, 'গাঙ্গুলী কুসুমডিঙে যে বাকি থাকল।' কাতরকণ্ঠ গাঙ্গুলী মোড়লদের গলির পথে ঢুকিবার আগে উষাং মোল্যানকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, 'ওটো সাপেই করবে টে, প্রাণ লিয়ে এখন বাড়ি যা।' তাহাই হইল —কুসুমডিঙা দেখিবার জন্য কেহই উপস্থিত রহিল না।

বাসরঘরের দরজার দু পাট খোলা, হা-হা করিতেছে। নির্জনতা দ্রুত বাড়িতেছে। গৃহবন্দী মমি দুইটির একটি চঞ্চল হইয়া উঠিল; ছেঁড়া শতরঞ্চের আবরণ মোচন করিয়া ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া নমিতা সাপটির গতিবিধি জানিতে চাহিল।

দেখিল প্রবল বেগে কেরোসিন শিখা চোরকুঠুরি অন্ধকার করিয়া জ্বলিতেছে। দগ্ধবদনে সর্পাতঙ্কে নিদ্রিত, ক্লান্ত হারাঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া নমিতার প্রাণে একটি নিরাসক্ত করুণা ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই সতর্ক ও সন্ধানী হইয়া উঠিল। দেহমন ছমছম করিয়া উঠিল—উঠানের কুলতলায় কে যেন শাদা শাড়ি পরিয়া দাঁড়াইয়া। নমিতা ঘরের দরজা বন্ধ করিল এবং একবার ঠাকুরের মুখের দিকে সন্ধানী চোখ বুলাইয়া, পেট-আঁচলে দলিলটির অস্তিত্ব অনুভব করিয়া আশ্বস্ত হইল। মুক্তিলাভের এই শুভক্ষণ বেশিক্ষণ স্থায়ী হইবে না। নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল, পথে তাহাকে বাহির হইতেই হইবে।

ইতিপূর্বে মানিকপুরের নন্দ রায়ের গান-পাগলা ভাইপো ব্রজদুলালের সঙ্গে বিবাহের রাত্রে গৃহত্যাগের কথাবার্তা পাকা করিয়া রাখিয়াছে। সাবীখুড়ির আশ্রয়ে থাকাকালীন গোপনে জল তুলিবার অছিলায় ব্রজ-র সহিত নমিতা দেখা করিত। ব্রজ নিশ্চয় রায়পুকুরের পাড়ে নমিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নমিতা শেষবারের মতো

হারাঠাকুরের নিদ্রিত মুখের দিকে তাকাইল এবং কি মনে করিয়া শতরঞ্চি দিয়া হারাঠাকুরের শায়িত দেহটি ঢাকিয়া দিল।

কুলতলায় মুর্তিটি কি এখনো দাঁড়াইয়া আছে? উঁকি মারিয়া নমিতা বাহির দিকে তাকাইতেই বিদ্যুতের আলোয় এক আঁটি শুকনো খড় কুলতলায় ঝুলিতে দেখিল। বুকে সাহস ফিরিয়া আসিল। নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হইয়া সন্তর্পণে ডান দিকের সাহানা পুকুরের ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিদ্যুতের আলোয় শূন্য দেউল একবার ভাসিয়া উঠিয়া পুনরায় গভীরতম অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল।

সাহানার জলপ্লাবিত জঙ্গল পথে একটি ধীর গম্ভীর পদক্ষেপের ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দ জাগিয়া উঠিল। থাকিয়া থাকিয়া একটি ব্যাঙ সাপের মুখে বসিয়া আর্তনাদ করিতেছে। শব্দটি নিকটবর্তী হইলে ত্রিশূল হস্তে জটাজুট-লাঞ্ছিত একটি অর্ধোলঙ্গ কায়া ফুটিয়া উঠিল; ক্রমে ক্রমে উহা হারাঠাকুরের উঠানে উঠিলে, বিদ্যুতের আলোয় চমকিত হইয়া স্বরূপে ধরা দিল।

নৈশ-ত্রিশূলধারী অভিযাত্রী কাপালিক গোপীনাথ, নমিতার ভাবী বরের তালিকা হইতে খারিজ হইয়া তন্ত্রানুশীলনে তৎপর হইয়া ওঠে।

অদ্য কালীতলা মহাশ্মশানে তন্ত্র-সাধনাকালীন নমিতার মুখ থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের মতোই চমকিয়া উঠিতেছিল। তন্ত্রার্জিত ক্রোধ কালমেঘের মতো তান্ত্রিক গোপীনাথের ভ্রূযুগল আচ্ছন্ন করিয়া হারাঠাকুরের উপর বর্ষিতে উদ্যত হইল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তান্ত্রিক গোপীনাথ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে নিশীথ রাত্রির বজ্র-বিদ্যুৎকে উপেক্ষা করিয়া হারাঠাকুরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছে। হাতের ত্রিশূলটিকে বাগাইয়া ধরিয়া বিড়ালের মতো লঘু পদক্ষেপে উন্মুক্ত চৌকাঠের নিকট আসিয়া গোপীনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল।

জরাজীর্ণ চালের মুক্তগবাক্ষপথে প্রক্ষিপ্ত বিদ্যুতের আলোয় শবাসনে ধরাশায়ী প্রতিপক্ষ হারাঠাকুরকে দেখিয়া গোপীনাথ চমকিয়া উঠিল।

সুষুপ্ত হারাঠাকুরের দিকে লঘুপায়ে কয়েকটি বাস্তু ইঁদুর অগ্রসর হইতেছিল। ত্রিশূলধাবী গোপীনাথ সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া উহারা পালাইতে গিয়া মুমূর্ষু লম্ফটিকে উল্টাইয়া দিল। সারা ঘর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

হারাঠাকুর কি মৃত ? মুহূর্তে চিন্তাটি তান্ত্রিক গোপীনাথের বুকে ছোবল মারিয়া ঝিমাইয়া পড়িল। ত্রিশূল নামাইয়া জটাবাহী জল-বিন্দুতে আচ্ছন্ন মুখমণ্ডল মুছিয়া পরবর্তী বিদ্যুতের আলোর জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরমুহূর্তে বিদ্যুতের আলোর তালে তাল দিয়া চৌকাঠের এ প্রান্ত হইতে ঘরের অভ্যন্তরে ঝাঁপ দিল, এবং আবার পরবর্তী বিদ্যুতেব আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিল। অতঃপব গোপীনাথ হারাঠাকুরের শিয়রে ত্রিশূলটি প্রোথিত করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে হারাঠাকুরের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল ও স্বীয় বামকর্ণ ঠাকুরেব বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া তাহার হৃদ্‌স্পন্দন শুনিবার প্রয়াস পাইল। প্রবল আতঙ্কে তান্ত্রিক গোপীনাথের নিঃশ্বাস এত ঘন ঘন পড়িতেছিল যে গভীর নিদ্রায় অচৈতন্য হারাঠাকুরেব হৃদ্‌স্পন্দন শুনিতেই পাইল না।

হঠাৎ এক গভীরতম আতঙ্কে গোপীনাথের বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া উঠিল; বোধ হইল তাহাবও হৃদ্‌স্পন্দন চলিতেছে না। হঠাৎ গোপীনাথ হারাঠাকুরের নিদ্রিত কাষ্ঠবৎ হস্তটি নিজবক্ষে চাপিয়া স্বীয় হৃদ্‌স্পন্দন শুনিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু স্বীয় বক্ষোস্পন্দনানুভবে অপারগ তান্ত্রিক গোপীনাথ ধীরে ধীরে ঠাকুরের পার্শ্বে শয্যা রচনা করিয়া অপসৃয়মান অন্ধকারে শবাসনে শুইয়া রহিল।

কিংকরের ফলার

যাব কি যাব না, কথাও শোনে না পা। সোনামুখী কান কামড়ে বলেছে, "যেও না ওগো, বাবাজীর গাঁজার আসরে যেও না।"

"আমি কি গাঁজা খেতে চললাম? শুনেছি বাবাজী পেসাদ বিলোয়। ঠাকুরের পেসাদ খেয়ে কি আমার জাত যাবে, না আছে কিছু?'—এসব ভাবতে ভাবতে কিংকর ময়ূরাক্ষীর কোলে শুয়ে থাকা গাবগাছের আড়ালে ঝিলেরার মন্মথ বাবাজীর আখড়ার দিকে সাঁঝ নামতেই পা বাড়াল।

তুলসীমঞ্চের দিকে মুখ করে আখড়ার উঠোনের মাঝবরাবর সভা আলো করে সাদা কম্বলের আসনে বাবাজী মন্মথ বসে আছেন। দু-চারজন গ্রামবাসী বাবাজীর আশপাশে বসে গামছা দিয়ে মশা-ডাঁশ তাড়াচ্ছে। বাবাজীর সামনে নামানো অধরা আগুনে ভরা গাঁজার কল্কে। উনুনশালা থেকে লাল আগুনের আভা এসে পড়ছে বাবাজীর মুখে। বাবাজী ভাবেন মনে মনে। কাকে রেখে কাকে ফেলবেন। প্রথমেই শিবের মুখ মনে পড়লো। তাকে এড়িয়ে তো কল্‌কে ধরা যায় না! কিন্তু বোষ্টম হয়ে বিষ্ণুকে এক কল্‌কে উৎসর্গ না করে মন্মথ ধরেন কোন্ মুখে! ইষ্টদেবের ধ্যান সেরে গঞ্জিকা নিবেদন করতে উদ্যত হলেন বাবাজী।

তাঁর ফাঁসালো দাড়ির ভাস্কর্য শ্রাবস্তীর কারুকার্যকেও হার মানায়। অনায়াসেই বাবাজী বিদেশে ভারত উৎসব থেকে সোনার ময়ূর আনতে সক্ষম।

বাবাজীর নীরবতায় অধীর একজন গঞ্জিকাপ্রেমিক ভক্ত বলে উঠল, "কই বাবাজী বাজাও বাঁশী!" ত্বরিতে 'জয় রাধে' বলে বাবাজী বজ্রমুষ্টিতে বাঁশী ধরে সুর তুললেন 'সোঁ—ওঃ ওঃ'। গুলগুলিয়ে মশা তাড়িয়ে নীল ধোঁয়া মা-গঙ্গার মত বাবাজীর শ্মশ্রুজালে আবদ্ধ

থেকে ঘুরপাক খেতে লাগল। তারই সঙ্গে ঘুরতে লাগল বাঁশী এ-হাত থেকে ও-হাতে! মাঝে বাবাজীর বাণী। বাণীতে কতটুকু প্রেম, কতটুকু থুথু, একমাত্র বাবাজীর নিকটবর্তী মুমুক্ষুরাই বলতে পারেন। দেওয়ালীর তুবড়ীর মত অন্ধকার চূর্ণ করে চড়চড় করে বাবাজীর কল্‌কে থেকে নীল আগুনের ফিন্‌কি বেরোয়। সেই আগুনের আলোয় বাবাজীর লাল চোখের মণিদুটো রক্তমুখী বাবলাকাঁটার মত চেয়ে থাকে। বাঁশীতে বুকভর মধু-চুম্বন দিতে দিতে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লেন বাবাজী। মাগুর মাছের মত বাবাজীর নাক ফেটে 'কোঁক্ কোঁক্' আওয়াজ বের হ'ল, কিন্তু এক ফোঁটাও ধোঁয়া বেরোল না। প্রসাদ-ভিক্ষু ভক্ত-কণ্ঠে বাবাজীর জয় ঘোষিত হ'ল। ভক্তবৃন্দের জয়গানে যোগ দিয়ে গাবগাছে বসে থাকা একটা রাত-কানা বক ডেকে উঠলো।

অন্ধকারে আম-জাম, কাঁঠাল-তাল, বাঁশ-অর্জুনের ঝরাপাতায় ভরা পথে শপ্‌শপ্ শব্দ তুলে শেষ পর্যন্ত কিংকর বাবাজীর আখড়ায় উপস্থিত হল। শিবনেত্রে বাবাজী কিংকরকে এক নজর দর্শন করলেন। মূর্তিমান রসভঙ্গ কানা কিংকরের অযাচিত আগমনে বিরক্ত ভক্তবৃন্দ গঞ্জিকায় অধিকতর মনঃসংযোগ করল।

অনাহ্বানে হতমান মলিন কিংকর বিনা অনুমতিতেই উঠানের এক পাশে বসে পড়ল। তার মনটি গেল আমলিয়ে। কানা তো সে আর সাধ করে হয় নাই। বাঁশ কাটতে পাটবাড়ি লেগে বাঁ-চোখটা জখম হ'ল। দেড় বিঘে জমির মালিক বাপ-মা মরা চাষার ছেলের চোখ গেলে কবে আবার চোখ হয়?

গাঁজার আসর টপকে একচক্ষু কিংকরের দৃষ্টি পড়ে আখড়ার চাতালে। থানকাপড় পরে বোষ্টমী পিতলের কড়াই-এ লুচি ভাজছে। ঠাকুরের ভোগ হবে। আগুনের লাল আভাতে বোষ্টমীর গাল দুটো দু-ফালি পাকা তরমুজের মত মনে হচ্ছে! পাটকাঠির জ্বালে কড়াইয়ের ঘি কলকল করে উঠছে। গরম ঘিয়ের ভাপ লেগে বোষ্টমীর কপালের অলকা-তিলকা গলে পড়ছে তার লাল গাল বেয়ে।

কিংকর চোখ বুজে পরিষ্কার দেখল, ফুটন্ত গাওয়া ঘিয়ের কড়াইয়ে টবকা লুচি টগবগ করে নাচছে। মনে মনে বলে উঠল কিংকর, "বাহারের ধর্ম, গরম গরম দুধ-লুচি, মণ্ডা-মেঠাই।"

জবজবে পুরু সরে ঢাকা এক বাটি ভাপ-ওঠা দুধ, এক রেকাবী ফুলকো লুচি। তুলসীতলায় হাত বুলিয়ে নামিয়ে রেখে বোষ্টমী প্রভুকে নিবেদন করার জন্য মন্মথকে অনুরোধ করল!

দেখে ফুলকো লুচি, দুধের বাটি কিংকরের রসনা ধায় গুটিগুটি।

চেঁডাকাটা ছাঁদে দু'হাত পেঁচিয়ে গোটা তিনেক আঙ্গুল ফুটিয়ে ভোগ নিবেদন করলেন বাবাজী।

চারিদিক চুপচাপ, গাছের পাতাটি নড়ে না, নিবেদনকালে উপাচারে দৃষ্টিপাত ভোগনাশক। সকলে অন্য মনে অন্য মুখে তাকিয়ে রইল। অনাচারী মূর্খ কিংকরের ধর্মবিজ্ঞানের বড়ই অভাব। অপরূপ লোভে, অকপট চোখে ভোগের দিকে চেয়ে থাকে কিংকর।

চোখ খুলতেই বাবাজীর চোখ আটকে গেল কিংকরের হাঁ-এ। পাকা গাবের গন্ধে আকুল একটা বাদুড় ঝট্‌পট্ করে উঠল।

ক্রমে মন্মথর মুখে ধীরে ধীরে এক রহস্যময় কৌতূহলী হাসি ফুটে উঠলো।

ডায়ে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে শিবনেত্রে সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে বাবাজী বললেন, "ঠাকুরকে দুধ-নুচি দিয়ে ডাকলাম, কোন সাড়া নাই। আবার ডাকলাম, এবারও কোন সাড়া নাই। আকুল হয়ে আবার ডাকলাম। এবার ধমকে উঠে ঠাকুর বললেন, 'তুই কি পাগল হলি মনা? তোর ডাকার অনেক আগেই আমার ভোগ চলছে।' -- অবাক কাণ্ড! ঠাকুর বলে কি! আমার মনের কথা আঁচ করে ঠাকুর বললেন, "আমি কানা কিংকরার লোলা দিয়ে খেয়েচি।"

বাবাজীর কথা শুনে অনেকের বাবার নেশা কেটে গেল, কেউবা মুচকি হাসল। হতবাক কেবল কিংকর। তার মধ্যে আবার ঠাকুর আছে নাকি? শুধু থাকা নয়, তার মুখ দিয়ে ঠাকুর খেয়েচেন। কিন্তু কই, মুখে তো কোন স্বাদ লেগে নাই? তবে তার লালসা

হয়েছিল। সঙ্কুচিত কিংকরকে আহ্বান করে বাবাজী বললেন, "আয় কিংকরা, লজ্জা কী? আমার ঠাকুর তোর জিভেও আছেন।" এই বলে সরে-ভেজা একখানা লুচি কিংকরের দিকে এগিয়ে দিল।

সসম্ভ্রমে লুচিখানি নিয়ে আলগোছে কপালে ঠেকিয়ে কিংকরের রসনা জীবনে এই প্রথম গাওয়া-ঘিয়ের লুচির স্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হ'ল। লোভ-সংবরণ করে লুচিটুকু গালের পাশে ফেলে রেখে জিভের ডগা দিয়ে একটু একটু করে দাঁতের দিকে এগিয়ে দেয় কিংকর। পিঁপড়ের মত টুঙে টুঙে লুচি খায়। বাবাজীর কাণ্ড দেখে অনেকেই প্রসাদ না পেয়েই উঠে গেল। কিংকরার এঁঠো খেতে কেউ তো আখড়ায় আসে নি।

নিশ্চুপ অন্ধকারে জোনাকী জ্বলে আর নেভে। নিমীলিত শিবনেত্র বাবাজী স্তব্ধ। বোষ্টমী করতাল এনে বোষ্টমের কানের কাছে ঝুনুঝুনু বাজিয়ে বাবাজীর ধ্যানভঙ্গ করল। অনুনাসিক স্বরে সুরসাধনা করে বাবাজী কিংকরকে দোহারী হতে বলল। সানন্দে সম্মতি জানিয়ে কিংকর বাবাজীর মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে রইল কখন শ্রীকণ্ঠ জেগে উঠবে।

নিরন্ধ্র অন্ধকারে, গুমোট গরমে শ্রীরাধিকার বিরহবেদনায় বাবাজী ঘেমে উঠে কীর্তন সুরু করলেন। বাবাজী যে কলিটি গেয়ে ছাড়েন হুমড়ি খেয়ে সেই কলিটি ধরে গেয়ে ছাড়ে কিংকর।

কীর্তনের সুরে ভেসে গেল অনেক সময়, শ্রীরাধিকার বিরহে বাজে ভাটির টান। ঘুমের ঘোরে বোষ্টমীর হাত থেকে খঞ্জনী পড়ে গেল। আসর ভাঙল।

সন্ধ্যার অভাবনীয় আপ্যায়নের অনুভূতি কিংকরের মনে তখনও ভুরভুটি কাটছিল। কীর্তন রসামৃতপানে গদগদ ব্যাকুল-চিত্ত কিংকর অন্ধকারে মরাপাতার পুরু আস্তরণ মাড়িয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। সদ্যলব্ধ গুরুপাক আনন্দ হজম করার তাগিদে গুরুগীত কীর্তনের শেষ কলিটি গেয়ে উঠল—"রাধার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে পাঁজর ধ্বসিয়া গেল।"

মধ্যরাতে অতর্কিত কীর্তনের আর্তনাদে বাঁশবনের পাঁজর মড়মড় কটকট করে বিরহবেদনা মোচন করল ; অসময়ে ঘুমভাঙ্গা কয়েকটি কাক কা কা করে ডেকে উঠল।

বাড়ির উঠোনে পা দিতেই সোনামুখী অসহিষ্ণু অনুযোগে ফোঁস করে উঠে বলল, "রাধার পাঁজর ধ্বসলো তো তোমার এত দুঃখ কীসের? ইদিকে আমার পাঁজরের তল্লাস কিছু রাখ?" গঞ্জনাতাড়িত কিংকর চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিংকরের নীরবতা মধ্যরাতে সোনামুখীর কণ্ঠস্বরকে আরও তিক্ত ও তীক্ষ্ণ করে তোলে। ঝলসে ওঠে অনুযোগ সোনামুখীর গলার ঝাঁঝে।—"বলি, কাঠঠোকরার মত দিনরাত পোঁদ নাচিয়ে আমার পাঁজরার কী হাল করেছ, সেদিকে একডুন খেয়াল আছে?" মরমে ম'রে কিংকর মৌন থাকে।

কিংকরের অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকাটাও সোনামুখীর অসহ্য ঠেকে। সোনামুখী বলে, "তা ঢঙ করে মাঝখানে দাঁড়ান ক্যানে, ত-লগরে পিণ্ডি সজ করা আছে. গিলে আমাকে খালাস দাও।" সোনামুখীর জিভের তাড়নায় কিংকরের রস শুকিয়ে আমসি— "ক্ষিদে নাই।" বলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে কিংকর বারান্দায় পাতা রাতের বিছানায় গিয়ে বসে।

কিংকরের উত্তরে সোনামুখীর মেজাজ বাড়ে। বলে, "ক্ষিদে নাই, বাবাজীর আখড়ায় আজ কি ফলার ছিল?"

ফলারের নাম শুনে কিংকরের ঝিমিয়ে পড়া মন ঝাড়াপোড়া দিয়ে জেগে বসে। উদাসী সুরে কিংকর সোনামুখীকে জিজ্ঞাসা করে, "তু কোনোদিন ফলার খেয়েছিস?"

"শোন কথা, মাঝরেতে ফলারের গপ্প ; পোড়া কপাল আমার ; হাসি না কাঁদি?" অবশ্য না কেঁদে না হেসে ক্লান্ত হাই তুলে সোনামুখী বলে, "ফলার পরে খেও, এখন দুটো পান্তাভাত দু'গাল মুখে দিয়ে শোও।" কিংকর শুয়ে পড়ে উত্তর দিল, "তু' খেয়ে লে সোনামুখী, আমি আজ আর মুখ পাল্টাব না।" কিংকর চোখ বুজল।

ঘিলু-পাতলা ছিটেল স্বামীর মতি-গতি কখন কোন্ দিন কোন্ দিকে যায়-আসে, সোনামুখী আজও তার টের পেল না। অগত্যা জিভকে জামিন দেবার জন্য ঘরে গিয়ে পান্তা ভাত দুটো মুখে তুলবে এমন সময় লম্ফর আলোর সামনের দেওয়ালে ফুটে উঠল কালো এক রাক্ষসীর ছায়া। ঐ ব্যহায়া ভূতের সঙ্গে পিণ্ডি গিলতে রুচি হ'ল না সোনামুখীর, ভাত হাতেই রইল। উঠে হাত ধুয়ে দরজায় তালা-চাবি দিয়ে শয্যাশায়ী পেটুক স্বামীর মাথার গোড়ায় গিয়ে চুপ করে বসল সোনামুখী। লম্ফটা বিছানার মাথার দিকে টিমটিম করে জ্বলছে। কিংকরের চোখ বোজা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট, গাল নড়ছে।

সোনামুখীর চোখে ঘুম নাই। কিংকরের নিদ্রিত চঞ্চল মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সোনামুখীর মনে পড়ে গেল তার বিয়ের রাত। মালাবদলের সময় কিংকরের মূর্তি দেখে হাত দুটো থরথর করে একবার কেঁপে উঠেছিল! কিন্তু ঐ পর্যন্ত। এক চোখে কিংকর তাকিয়ে আছে। ভাঁজপড়া কপালে শিরার জটিল ত্রিশূল দপ্‌দপ্‌ করছে। বিয়ের বাসর থেকে বেরিয়ে যাবার কালে ফুলি মোল্যানের সেই খেদোক্তি 'দাঁড় কয়োত পাকা বাম (আম) লিলেরে'।

বলবে নাই বা কেন? মুখ পুঁছে, চুল বেঁধে, টিপ পরে আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারত না সোনমুখী। বয়সকালে বিনা পানেই ওর রাঙা ঠোঁটে কামরাঙা হাসি টুস্‌টুস্ করে আপনা-আপনি ঝরে পড়ত। নিজের গালের টোল দেখে নিজেরই হিংসা হত। করমচা ঠোঁট সোয়াগের আশার কেবলই ফুলে ফুলে উঠত। চড়ুইপাখির মত আয়নার বুকে ঠোঁট ঘসে আশ্‌ মিটত না সোনামুখীর।

ফোঁকোসে খেল সে রূপ সে যৌবন। কুঁড়ি ফুটতে না ফুটতেই বিয়ে হ'ল। বছর ঘুরতেই পেটে এ'ল ফল। সেও চলে গেল। থাকতে আছে ঐ অবুঝ পেটুক স্বামী। ওর আবদার সহ্য করতেই সোনামুখী হাঁই-ফাঁই করে ওঠে।

অবুঝ শিশুর মত কিংকর মাঝে মাঝে সোনামুখীর কোলে মুখ গুঁজে বায়না ধরে। সোনামুখীর নরম মন গলবার ফাঁক খোঁজে। কিংকরের মাথার চুল শুঁকতে শুঁকতে কিংকরকে কোলটান মারে। দেহ খেলেই তো মনে সয়।

হাসি পায় সোনামুখীর। ভাল-মন্দ খাবার বায়না ধরে লোকটা। পোড়া কপাল সোনামুখীর। নিজের হাতে মনোমত করে একদিন ভাল-মন্দ খাওয়াতে পারল না স্বামীকে, কিন্তু আঁইড়ে লাগা ছেলের মত ঘ্যানর ঘ্যানব কবলেই সোনামুখীর গা-পিত্তি গুলিয়ে ওঠে। বিছানার দিকে এক নজর চাইতেই সোনামুখী দেখল কিংকর হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে।

ঘুমন্ত কিংকবের স্বপ্নবাজ্য জুড়ে তখন বিশাল ভোজসভার আয়োজন। নীলহলুদ সামিয়ানাব নিচে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াই-এ রকমারি রসগোল্লা, পানতুয়া ড্যাবড্যাবিয়ে কিংকরের দিকে তাকিয়ে আছে। ঝোল টানে কিংকব। ফলাবে অহেতুক বসতে দেরী করছে কেন সবাই। কিংকরের তর সয় না। মণ্ডা আর মনোহরা, পানতো আজ গামলায় ভরা—আহা! পাত পেতে বসে পড়ে কিংকর। যেমনটি দেখে তেমনটি সুর করে গেয়ে ওঠে কিংকর:

আমি আশায় আশায় পাত পেতে বসেছি,
আমাকে গরম গরম দাও লুচি।

বিশাল পিতলের রেকাবীতে মণ্ডা সাজিয়ে হাসি মুখে একটা লোক পরিবেশনে এগিয়ে আসছে। কিংকর গাইল:

এবার তবে মণ্ডা এল,
পরানটা মোর ঠাণ্ডা হ'ল।

একজন এসে পাতে ক্ষীর দিয়ে গেল। কিংকর এবার ধরল:

আমার ক্ষীরেতে পাত ভেসে গেল
ফলার খেয়ে উঠতে পারলে বাঁচি।

গান গেয়ে ক্ষীরে লুচি ভিজিয়ে যেই মুখে দিতে যাবে কিংকর অমনি কোথা থেকে এক অজগর সাপ এসে পাতা শুদ্ধ ফলার গিলে

চোখের নিমিষে চাঁ করে মিলিয়ে গেল। আশাভঙ্গে বেপরোয়া কিংকরের ঘুমন্ত ঠোঁট ফেটে বু-বু শব্দ বেরিয়ে আসে। সোনামুখী কিংকরের থুতনিতে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কী হয়েছে ?"

দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে হতাশ কিংকর। সর্বাঙ্গ তখনও কলকল করে ঘামছে। বিস্ময়-করুণ কণ্ঠে দম ছেড়ে ছেড়ে কিংকর বলে, "এক গেলেস জল দে, বুকটো ঢুই ঢুই করছে—কি বিরাট সাপ. আর কি বিরাট তার হাঁ। ...চোকের পলক ফেলতে না ফেলতে চাঁ করে মিলিয়ে গেল।" সোনামুখী চুপচাপ। সভয়ে সোনামুখীর দিকে আধ-নজর তাকিয়ে অসহায় বিষাদে ভেজা গলায় কিংকর বলল, "তুমি ঘুমুও নাই ?"

কিংকরের মুখে তুমি ! তামাসা মন্দ নয়। সোনামুখী মিস্‌মিস্ করে হেসে বলে—

"না।"

"ক্যানে ?"

"জেগে হেসে স্বপ্ন দেখছিলাম বলে।"

কিংকর নিরুত্তর।

"এবার তুমি জেগে জেগে, আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি।"

সোনামুখী হাত পায়ের গিঁট ছাড়িয়ে হাই তুলে শুয়ে পড়ে বিছানায়। মাথার গোড়ায় বসে কিংকর। এমনি করে কখনও জেগে কখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে কিংকর-দম্পতির রাত পোহাল। সকাল হ'ল। রক্ত-চন্দনের তেলে পালিসকরা কচি গাবগাছের পাতায় পিছলে পড়ছে জ্যৈষ্ঠ মাসের সোনালী আলো।

কিংকর গাঁতোতে চাষ করে শ্রীরামপুরের ইদ্রিস শেখের সঙ্গে। শেখের বলদ—কিংকরের এঁড়ে। সর্বসাকুল্যে বিঘে দেড়েক জমি। মাঝে-সাঝে দিনমজুর। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। এখনও একবস্তা সার পড়ল না মাঠে ! রসনাচর্চায় উপেক্ষিত কৃষকসত্তাটি কিংকরের মনে কুড়কুড় করে জেগে ওঠে। কাজের জন্যে হাত কামড়ায়। কোমরে গামছা বেঁধে কোদাল নিয়ে এক বস্তা সার ভরে মাথায় চাপিয়ে

কিংকর মাঠে চলল, তা দেখে সোনামুখী মুচকি হাসে, সে হাসির ইসারা বুকে তুলিয়ে কিংকর ময়ুরাক্ষী নদীর মেদের দিকে অগ্রসর হ'ল।

ময়ুরাক্ষীর উত্তর গা বরাবর পাকা সড়কের ধারে এসে ধপাস্ করে বস্তা নামায় কিংকর। একমাত্র চোখে ঘাম পড়ে জ্বালা করছিল। বোঝা নামিয়ে গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বস্তাটা মাথায় তুলতে গিয়ে পশ্চিমদিকে নজর গেল। দেখল জন তিনেক মুনিষ খড়ে মুড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ বাঁকে করে নিয়ে আসছে। বাঁকগুলো ধনুকের মত দু'পাশে ঝুলে পড়ছে। মাছের ল্যাজা মাটি ছুঁই ছুঁই।

ভারীরা কাছে আসতেই বাঁহাতে কানা-চোখ আড়াল করে ভাববাচ্যে কিংকর জিজ্ঞাসা করল, "তা কতদূর যা' হবে?" তুলকি চালে চলতে চলতে মাঝের ভারী বলল, "আজ মৌরকাঁদির বাবুর বেটার বৌভাত, রেতে 'ফলার'।"

কথাটা শুনেই কিংকরের কানে ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠল। ভয় ও আনন্দের দোদুল দোলায় দুলতে দুলতে কিংকরের মন স্বপ্নে-দেখা ফলারের স্মৃতি ভেসে উঠল। শিরশিরিয়ে উঠল সারা গা। চোখ বুজল কিংকব। দাঁতালো হা-এ তেড়ে আসছে যেন অজগর সাপটা।

চোখ খুলল কিংকর। চারদিক রোদে ভাসছে। ভারীদের চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দেখল কিংকর, ওরা সাবলদার বাঁকে উঠে পড়ছে। অগত্যা শূন্য মনে সারের বোঝা পুনরায় মাথায় চাপিয়ে কিংকর জমিতে সার ছড়াতে এগিয়ে গেল।

কাজ শেষ হতে বেশী সময় নিল না। দশটার 'মা-মনসা' বাস তখনও যায় নাই। নদীর জলে হাত-পা ধুয়ে একটা ছায়াঘন জাম গাছের নিচে বস্তা পেড়ে উন্মনা কিংকর এসে বসল। আনমনে ডান পায়ের গোড়ালী দিয়ে বৃত্তাকারে বালি মেজে মেজে ভেবে চলে কিংকর। একটা ঘুরঘুটে পোকা ওর মনকে গোল করে ফুড়ে ফুড়ে কেবলই বলে চলছে—'রেতে ফলার।'

অজগর-ভীতি কিংকরের রসনার স্বাধিকারকে বেশিক্ষণ আছন্ন

রাখতে পারল না। এমন অযাচিত ফলারের সংবাদ জীবনে আর না-ও আসতে পারে। কিংকর ফলারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ব্যাঙের পেটের মত হঠাৎ ফুলে ওঠা হৃষ্টমনে অতর্কিতে কে যেন চাকু চালিয়ে জিজ্ঞাসা করে ঃ তোমার কি নেমন্তন্ন আছে, কিংকর ? ফুটো ঢোলের মত হাঁ-হাঁ খাঁ-খাঁ করে ওঠে ওর মন।

অভিমানে চোখ ফেটে জল আসে। কেন লোকে তার মুখে ফলারের কথা শুনলে হাসে। ফলার খাবার অধিকার কি ওর নাই ? রাগে নিস্‌পিস্‌ করে মন। মনে হয় দু-কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, মনের রাগ মনেই বরফ হয়ে থাকে, গলতে ফুরসুৎ পায় না। একে গরীব তাতে কানা, ওর মনের হদিস জানবে কোন্‌ জনা। একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে।

কিন্তু বাবলাজী তো বলেছিলেন, তিনি রসনার মধ্যেও আছেন। তার মন ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। শত্রুরাই শুধু তাকে বলে রবাহূত, অবাঞ্ছিত উপদ্রব, কিংকর কারও কথা শুনবে না। ঈশ্বরকে জিভের ডগা থেকে ফুঁ করে ফেলে দেওয়া যায় না। রসনার ঈশ্বরের নির্দেশই কিংকর মেনে নেবে। বাবুদের বাড়ির ফলার খেয়ে কুলীন হবে। রসনা তো লৌকিকতা, নিমন্ত্রণের ধার ধারে না। মানুষ হয়ে জন্মে নিজেকে কি সে একদিন নেমন্তন্ন করতে পারে না ? পারে—মনের থেকে কে যেন বলে উঠল।

যত নষ্টের গোড়া যতীন মোড়ল। গোটা গাঁয়ের নেমন্তন্নের ভার ওর। কতদিন কিংকর গাঁয়ের ভোজ-কাজের সংবাদ পেয়ে কাজের দিন বার-রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু ঘরবার করেছে, যদি চক্ষুলজ্জায় পড়ে নেমন্তন্নটা করে। কিন্তু আজ অবধি যতীনের টিকি ছাড়া আর কিছুই দেখে নি কিংকর। তবে আর কেন ? চল্‌ রসনা মৌরকাঁদি।

ঝট্‌পট বস্তা ঝেড়ে ধুলধুল পায়ে বাড়ি পৌঁছে কিংকর সোনামুখীকে উদ্দেশ করে বলল, "গামছাটো দে, কাপড় ছেড়ে চান করে আসি।" সোনামুখী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল—"বাসি কাপড় ছেড়ে এখন চান কি গো ?"

"কাপড়টা আর হাঁড়ি থেকে পিরানটা বার করে ভাল করে কেচে নীল দিয়ে মেলে দে।"

কৌতুক প্রমাদে পরিণত হয়। সোনামুখী শঙ্কিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "কোথাও যাবে নাকি ?"

কিংকর মাথা হেঁট করে বলল, "হাঁ, মৌরকাঁদি বাবুদের বাড়ি সন্ধ্যেরেতে বৌভাতের নেমন্তন্ন আছে।"

"তোমার নেমন্তন্ন ! বাবুদের বাড়ি !" বলতে বলতে সোনামুখীর ত্নচোখ সরসরিয়ে কপালে উঠল।

শুধু গাঁয়ের লোক নয়, সোনামুখীও কিংকরের নেমন্তন্নের কথা বিশ্বাস করে না। হায়রে, এসংসারে কেউই চায় না কিংকর ত্ন-একদিন ভালমন্দের মুখ দেখুক। বাবলাগাছে বাত্নড়ঝোলা হয়ে থাকে কিংকরের মন।

সোনামুখীর চোখে বিস্ময়ের ঢেউ তখনও মিলিয়ে যায় নি। সোনামুখী কিংকরের কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে তোমাকে নেমন্তন্ন করলে ?"

বাতায় গোঁজা গামছাখানা টান মেরে নিয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে তিরিক্ষি মেজাজে কিংকর সোনামুখীর দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল, "দেখ্ সোনামুখী, আমি এক চোখে কি আদ্দেকও দেখিনা ? না কানেও কিছু শুনি না……মনেব কত দরজা আছে জানিস ?" সোনামুখী থ' হয়ে শোনে।—"কটা তার খিড়কী ?…… আমার নেমন্তন্ন সেই খিড়কী পথে এসেছে।" সোনামুখীর খিড়কী-সদর ত্ন'ই ত্নপদাপ বন্ধ হয়ে গেল। ঘিয়ের গন্ধে স্বামীর ঘিলু নড়েছে; কোন প্রতিবাদ এখন অচল।

সোনামুখীর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে কিংকর চাপা গলায় মিনতি জানিয়ে বলে, "কথা বাড়াস না সোনামুখী, পাঁচ-কান হলে আগাম বাবুদের বাড়ি গিয়ে কেও কান ভাঙাচি দেবে।"

সোনামুখীর কি-ই বা বলার আছে আর কাকেই বা তা' বলবে ? স্বামীর লোলা দেখে সোনামুখীর গা গুলিয়ে ওঠে। লোকটার কোন

পিত্তি নাই। বেহায়ার মত বিনা নেমন্তন্নে কেউ ভোজ খেতে যায় ? লজ্জায়-ঘেন্নায় বোবা সোনামুখী পিরানের খোঁজে ঘরে ঢোকে।

কিংকর বিনা তেলেই গামছা পরে নদীতে স্নান করতে গেল।

দ্রুত স্নান সেরে গামছা পরে কিংকর বাড়ি ফিরে দেখল ঘরে তালাচাবি। সোনামুখীর কাপড়-চোপড়ও বাইরে নাই, ভিজে গামছা ছাড়ার উপায় নাই। নিরুপায় হয়ে কিংকর সোনামুখীর পথ চেয়ে ধারিতে বসে থাকে, আর মনে মনে বাবুদের বাড়ির খিড়কী দরজার সন্ধান করে। খিড়কী আর খুঁজে পায় না।

একবার মূলোর বেচন আনতে মৌরকাঁদি গিয়েছিল কিংকর। দেখেছিল মস্ত পাকা দেওয়ালে ঘেরা বাবুদের লাল দালানবাড়ি। সদর দরজার মুখে এক ভোজপুরী তেওয়ারী দারোয়ান খইনী খেয়ে যখন গোঁপে তা' দেয়, তখন দেখলে ভয় করে। ওরে বাবা ! ঢোকার মুখে যদি চবাং করে টুঁটিতে ধরে ? উঁহু ! ও পথ মাড়াবে না কিংকর। ঘুরে ফিরে দেখতে হবে। সদর যখন আছে তখন খিড়কী থাকবেই। পথ চলতে যদি চেনালোকের দেখা মেলে ? কেন ! কিংকর অ-পথে যাবে। ভোজ-আসরে দেখা হলে ? হুঁঃ, দায় পড়েছে ওদের। কিংকরকে চিনতে পারলে ওদেরই মানহানি হবে। কিংকরের উদ্বিগ্ন মন সাময়িক স্বস্তি লাভ করে।

রোদে মাথা চুঁইয়ে গালে ঘাম ঝরে কিংকরের। গাল পুঁছতে গিয়ে কিংকর অনুভব করে গালময় কুশকাঁটার মত খোঁচাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি চড়চড়, মড়মড় করছে। দাড়ি কাটতেই হবে। সেই মুহূর্তেই কিংকর নাপিতের সন্ধানে বের হয়।

কাপড় কেচে সোনামুখী বাড়ি ফিরল। ধূ ধূ করছে উঠোন। ভোকলাগা এঁড়েটি শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। রাগে কাপড় নামিয়ে গরুর দোনায় ছানি দিয়ে কাচা কাপড় মেলে দিল। কিংকরের ওপর মনটা বিষিয়ে উঠছে সোনামুখীর ; লোকটা বুড়িয়ে আঁটি হতে চলল, এখনও হ্যাংলামি গেল না। সময় তো পায়ে মাথায় সমান হল, কখনই বা হাঁড়ি চাপবে। গেল কোথা লোকটা ? ফলারের গন্ধে বেজায় বেহুঁশ !

কিংকরের কি দোষ ! নাপিতের খোঁজে সারা গাঁ, মাঠ-ঘাট ঘুরে নদীর ধারে শ্মশানঘাটের পাশে ডোমেদের তাড়িশালে কিংকর আবিষ্কার করল তার বাঞ্ছিত নরসুন্দরকে ।

তাড়ি খেয়ে ভাণ্ডারীর রস তখন গেঁজিয়ে উঠেছে । হন্তদন্ত হয়ে কিংকর হাজির হতেই গান ধরল, "মা আমার ন্যাংটাপুটো । পুটো ধরে আর ছাড়ে না ।"

ভাণ্ডারীর গান শুনে কিংকরের চোখে জল এল । অতি কষ্টে ঢোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে কিংকর তখন কাঁদো কাঁদো । হায় রে ! ফলারের সুবাস ছড়িয়ে সময় যে যায় যায় । করজোড়ে কিংকর বলে, "বেগত্যা করছি ভাণ্ডারী, গান থামা, আজ এক জাগা যেতে হবে, এক পোঁচ কামিয়ে দে, বাবা ।" বলতে বলতে টপ্ করে কিংকরের মৃত চোখ থেকে এক ফোঁটা জল খসে পড়ল ভাণ্ডারীর হাতে ।

ভাণ্ডারী শুধু এক নজর কিংকরকে দেখল । 'পুটো' ছেড়ে কোমরে গোঁজা একমাত্র ক্ষৌরযন্ত্র একটি স্থূলধার খুর বার করে জলাভাবে হাঁড়ি থেকে এক আঁচল তাড়ি নিয়ে কিংকরের দু'গাল ধুয়ে খরতর হাত খরিষ্ঠ দাড়িতে ঘসতেই কিংকর নাক সিট্‌কে বলল, "শেষ মেস্ তাড়ি দিয়ে দাড়ি ভিজুলি বাবা ?"

অপ্রস্তুত ভাণ্ডারী নেশার ঝোঁক সামলে বলল । "জল কোতা পাব খুড়ো, আর তাড়িতেই বা দোষ কী ? তাড়ি এনটিছেপটিক ।"

নাকমুখ কুঁচকে কিংকর জিজ্ঞাসা করে, "সি আবার কি ?"

"সে আর তোমার বুঝে কাজ নাই," বলেই কিংকরের ঘাড় ধরে দুগাল খেঁড়ো চাঁচার মত চেঁচে দিল, তারপর তাড়িতেই হাত ধুয়ে মুখে হাঁড়ি ধরে গলগল করে তাড়ি ঢালতে লাগল ।

গাল থেকে খুর খসতেই কিংকর পড়ি কি মরি করে ঘরমুখো ছুট ধরল । ঘামে জ্বলছে গাল । গালে হাত দিয়ে অনুভব করল কিংকর, কয়েক জায়গায় নুনছাল উঠে গেছে । কণ্ঠনালীর কিয়ৎ অংশ খুর স্পর্শই করে নাই । সদ্যক্ষৌরকৃত নুনছাল তোলা বদনমণ্ডলকে ব্যঙ্গ করবার জন্যই চোর-কাঁচাকীর মত লেগে আছে ।

চমচমে তুপুরে ঘরে পা দিতেই সোনামুখীর নাকের পেটি ক্রুদ্ধ বেড়ালীর মত ফুলে উঠল। বুকের কাপড়চোপড় সামলে বলল, "সারাদিন খ-নাই দ-নাই, সকাল থেকে ভূশুণ্ডি কাকের মত পিণ্ডি গিলবার জন্যে খাই খাই করে ঘুরে বেড়াইছ। আমি মাগী সারাদিন গতর ভাঙবো, সিদিকে একবার টুবকী মারবার সময় নাই।" বলতে বলতে সোনামুখী কিংকরের কাছাকাছি হতেই তাড়ির গন্ধ পেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলে, "ভরতুপুরে তাড়ি গিলে এলে?" বলতে বলতে হাতে মুখ গুঁজে এক মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ভরতুপুরে বু-বু করে কেঁদে ওঠে সোনামুখী।

হতভম্ব কিংকরের কোমরের গামছার গিঁট আলগিয়ে আসে। ধপাস করে ধারিতে বসে পড়ে। ক্রন্দসী সোনামুখীকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করে বলে, "বিশ্বাস কর। আমি শুধু তাড়ি দিয়ে দাড়ি কেটেছি। মুখের হাপা লে, যদি গন্ধ পাস, তা'হলে আঁশ বঁটি দিয়ে খান্‌খান্ করে আমাকে কাটবি।"

কিংকরের বয়ান শুনে সোনামুখী হাসবে না কাঁদবে। খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে বলে, "তা ঢঙ করে আবার বসলা কেনে, ডুবটো আর একবার দিয়ে এসো।"

মনে মনে গুরুকে স্মরণ করে কিংকর: হে গবিন্দ পরমানন্দ, ফলারে বসিয়ে দাও হে আনন্দ।

প্রসন্নচিত্ত কিংকর ময়ুরাক্ষীর হাঁটুভর নীল জলে পুনরায় স্নান সেরে শীতল প্রাণে সবুজগাছের ছায়ায় ঘরে ফিরে এসে দেখল, সোনামুখী উন্নুনশালে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে জ্বাল দিচ্চে। আগুনের লাল শিখাগুলি কালো হাঁড়িটাকে যেন গিলে ফেলছে। বেড়ার ওপর মেলে দেওয়া পিরানটির উৎকট নীল ভরা রোদের কড়া চাহনির দিকে সমানে চেয়ে আছে। নিঃশব্দে কাপড় পরে বেড়া থেকে পিরানটি তুলে কাঁধে ফেলে -কিংকর সোনামুখীকে বলল, "সূয্যিদেব ঢলঢল, ভাত হতে অনেক দেরী, সবেমাত্র সোঁ সোঁ করছে।"

উনুনে জ্বাল দিতে দিতে সোনামুখী নিস্পৃহকণ্ঠে উত্তর দিল, "পান্তা আছে, তাই না হয় এক গাস মুখে দিয়ে যাও।"

কিংকর খুসী হলেও মন থেকে তার ভয় কাটে না। সোনামুখীর দিকে না তাকিয়ে ঘরে ঢুকে পান্তা ভাত নুনে-জলে মাখিয়ে খেয়ে বাইরে এল। পুকুরে হাত ধুতে যাবার পথে কিংকর সোনামুখীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমি চললাম ফিরতে রাত হবে, তু খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়িস।" কিংকরের বিদায়বাণী সোনামুখীর কর্ণগোচর হ'ল কি হ'ল না তা বুঝবার অবকাশ না দিয়ে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে সন্তর্পণে কিংকর বাড়ির বার হল।

বাবুদের বাড়ি যাওয়ার পাকা সড়ক সজ্ঞানে পরিহার করে অনাহূত অতিথি কিংকর জ্যৈষ্ঠের অগ্নিস্রাবী রোদে বুকফাটা মাঠে মৌরকাঁদির পথে হেঁটে চলল।

ধূ ধূ মাঠে ঝিলমিলিয়ে ঝলাস ভাসে। মাঝেমধ্যে দু-একটা তিতির পাখি হুস্ হাস্ করে উড়ে যায়। কিংকরের কাঁধে সাধের পিরান ঘামে ভিজে সপ্‌সপে। তা' দেখে বিরস বসনে ভাবে কিংকর, সোনামুখীর হাতে কাচা পিরান পরে আসরে বসবে, তা আর হয়ে উঠল না। পশ্চিমে দপদপে, গনগনে ঘোলাটে সূর্যের দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে ভাববার চেষ্টা করে, সূর্যদেব কি কিংকরের রসনাদেবের নিমন্ত্রণের কথা অবগত নন! মেঘের জন্য একমুহূর্ত মৌনপ্রার্থনা জানায় কিংকর।

মাঠ পুড়িয়ে ঘাট শুখিয়ে সূর্যদেব যখন অস্ত গেলেন তখন কিংকর পাঁচপাড়ার দীঘির পাড়ে। দীঘির উত্তর গায়েই পাকা সড়ক, তারপর মৌরকাঁদি।

তরল অন্ধকারে দীঘির জলে হাত-পা ধুয়ে গাল মুছতে গিয়ে কিংকরের হাত পড়ল কণ্ঠনালীর ওপর জেগে থাকা অপাংক্তেয় দাড়িতে, লজ্জায় কাঠ হয়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ওপর সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে অভয় জানিয়ে কিংকর বলল; লজ্জা কিসের? মাথা হেঁট করেই তো খাবে, আর কতক্ষণেরই-বা ব্যাপার। পাতে পড়লেই চরাম করে সেরে নিয়ে দেলা চম্পটাং!

হঠাৎ কিংকরের কর্ণলোম শিহরিত হয়ে উঠল। বিয়েবাড়ির সানাই-এর মিলনের আকুল আহ্বান ভেসে এল কিংকরের কানে। কিংকর কড়ে আঙুল দিয়ে কান সুড়সুড়ি মেরে অন্ধকারে সুর অনুসরণ করে বাবুদের বাড়ির ঠিক দক্ষিণ গায়ে পাকা সড়কের ওপাশে একটা লাকুড়গাছের নিচে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল।

চারিদিকে আলোর রোশনাই, ভোজের গন্ধ, সুবেশ নরনারীর আগমন-নির্গমন—সবই অপরূপ চোখে লেহন করতে লাগল কিংকরের এক চোখ। সদর দরজায় গৌরবাবুকে দেখে কিংকরের যাহোক ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কপাল সুপ্রসন্ন, ভোজপুরী দারোয়ান আজ নাই। তবুও কেন যেন কিংকরের পা নড়ে না? আলোর পাশেই এই ঘন নির্জন আঁধারে নিজেকে গেছো-ভূত বলে মনে হয়। মনে মনে ভাবে কিংকর ওকে দেখলেই তো গৌরবাবুর মুখে জামরুল হাসি মুহূর্তেই ভীমরুল হয়ে ওর দিকে তেড়ে আসবে। ও যম-দুয়ার কিংকর কেমন করে পার হবে! গুরুহে, সদর দরজা পার কর।

ওকি! প্যান্টশার্ট পরা একটা লোক লাকুড়গাছের দিকেই তো এগিয়ে আসছে। উপায়ন্তরহীন কিংকর গলা খাঁকড়ী দিয়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করল। লোকটি চমকে উঠে বলল, "কে, কে ওখানে?" ভীতসন্ত্রস্ত কিংকর সরু গলায় ভয়ে ভয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমি, আপনাদের কিংকর।"

"তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? যাও, বাড়িতে যাও।"

সদরের দিকে নজর করল কিংকর, দেখল, বড়বাবু নাই, বাবুর ছেলে বিয়ের বর, হাসিহাসি গোলগাল মুখে লোকজনদের অভ্যর্থনা করছে। দূর থেকে পাত্র জিজ্ঞাসা করল, "কে হে?"

লোকটি উত্তর দিল, "আমাদেরই লোক।" কিংকর আর কালবিলম্ব না করে সটান সদর দরজায় গিয়ে গুঁড়ি হয়ে বরকে একটা নমস্কার জানিয়ে ফুড়ুৎ করে ভোজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। জয়গুরু! গুরুনামের কি মহিমা, কি পরম ভোজবাজী! অবহেলে কিংকর সদর দরজা পার হয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরে এলাহি কাণ্ড। কিংকর স্বপ্নেও এত বড় বড় পান্তুয়া-রসগোল্লা ভাসতে দেখে নাই। ধামা ধামা লুচির পিরামিড গড়ে উঠছে। ঘড়া ঘড়া কলের জল তোলা হচ্ছে। কিংকর এদিক-ওদিক তাকিয়ে গল্পের সেই তৃষ্ণার্ত কাকের মত একটা জলের ড্রামের ধারে চুপটি করে বসে পড়ল।

হঠাৎ গুরগুর করে একটা আওয়াজ শোনা গেল। মেঘ লাগল বুঝি? বরকর্তা গৌরবাবু হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির উঠোনে নেমেই ঘোষণা করলেন, "খেতে বসার জলদি ব্যবস্থা কর, মেঘ লেগেছে।"

কর্মীকুল শশব্যস্ত হয়ে উঠল। কিংকরের অন্তরাত্মাও গুরু গুর করে উঠল। সর্বনাশ! ফলার কি কেঁচে যাবে? হে গুরু, ঝড়কে একটু অপেক্ষা করতে বল, পাতে অন্তত পড়তে দাও। বাবুর এক কথায় সঙ্গে সঙ্গে ফলারে বসার ডাক পড়ল।

বাবুভাইরা বসলেন দালানের ভিতরে। সামিয়ানার নিচে কিছু গেরস্ত লোক বসে পড়ল। কিংকর বসল তাদের সারিতে। এবার গুরু গুরু মেঘের ডাকের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। নুন, পটল ভাজা পড়েছে. লুচি পরিবেশনও শুরু হয়েছে। সামিয়ানায় ঝড় বেজে সট্‌পট করে উঠল। লুচি পৌঁছে গেছে কিংকরের পাতে।

কিংকর এক চোখে সামিয়ানার দিকে তাকিয়ে দেখল, সামিয়ানা বাঁশ-দড়ি সবসুদ্ধ ছিঁড়ে চকা মোষের মত কোথায় বেপাত্তা ছুটে চলেছে। দমকা ঝড় উঠল। উনুনের ছাই ছড়িয়ে পড়ল পাতায় পাতায়, চোখের পাতায়। চোখ মুছে পটল ভাজাসুদ্ধ লুচিটি সদ্য মুখে দিয়েছে এমন সময় গোঁ গোঁ শব্দ করে এক কাল বৈশাখীর ঝড় হিংস্র শ্বাপদের মত আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভোজসভায়।

বাঁশ-সমেত সামিয়ানা চাপা পড়ল মৌরকাঁদির বাবুদের নিমন্ত্রিত অতিথিসহ কিংকর।

বাঁশের ঘা খেয়ে কিংকরের কপালে নুনছাল উঠে গেল, কপাল ফুলে উঠল। মুখের ভিতর লুচি যেমনকার তেমনি রইল, চিবুবার

অবসর হল না। ব্যাঙের মত গাল ফুলিয়ে কিংকর বুক দিয়ে আগলে থাকল ফলারের পাতা। বৃষ্টির ফোঁটা পড়বার আগেই কিংকরের চোখের জল এক ফোঁটা গড়িয়ে এসে ওর কয়েসে ঢুকল, উড়ুমুড়ি করে উঠল।

নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সঙ্গে কিছু কুকুরও চাপা পড়েছিল। তারাও প্রাণ ভয়ে চ্যাঁচামেচি ঝটাপটি শুরু করে দিল। অন্ধকারে নামল তুমুল বৃষ্টি। অন্ধকারে জলে ভিজে সাটপাট কিংকর আপন প্রাণ বাঁচাতে কুনুই-এর ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে সামিয়ানা থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল। হঠাৎ কুনুই পিছলে চাপা দিল সামিয়ানা-বন্দী একটি কুকুরকে। সভয়ে কুকুরটি কিংকরের কান কামড়ে ধরল। আত্মরক্ষার্থে কিংকর কুনুই-এর গুঁতে মারে। কেঁউ করে কুকুরটা গড়িয়ে যায় পাশে।

অবশেষে যখন ফলারের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এল তখন তাকে ভূতের মত দেখাচ্ছে। ভূতটার চোখে-মুখে কাদা, কানের লতি বেয়ে রক্ত ঝরছে।

বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার তীব্রতর হচ্ছে। ভূতরূপী কিংকর বৃষ্টির জল আঁচলা ভরে মুখ-চোখের কাদাবালি পরিষ্কার করে। তারপর মুখের ভিতর আবদ্ধ আতঙ্কিত মৃতপ্রায় লুচিটি চিবোতে থাকে।

চিবুতে চিবুতে আবার গাঁয়ের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে। ঘণ্টা দুয়েক ধরে জল-ঝড় ডাঙা-ডহর পেরিয়ে কিংকর বাড়ি পৌঁছল।

ক্লান্ত দেহে সিক্তবেশে দংশিত-কর্ণ কিংকরকে দেখে সোনামুখী নিশুতিরাতে আর্তনাদ করে উঠল। কিংকরের ললাট স্পর্শ করে দেখল তার সর্বাঙ্গ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বাক্‌হারা স্বামীকে ধরাধরি করে মেঝের তালাই-এর ওপর শুইয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল, "তোমার এ দশা হ'ল কেমন করে?" কিন্তু কে উত্তর দেবে? কিংকরের কানের ওপর নজর পড়তেই সোনামুখী দেখল একজোড়া ধারালো দাঁত দিয়ে কে যেন কানের লতি চিবিয়ে খেয়েছে।

কানের লতিতে হাত রাখতেই কঁকিয়ে উঠল কিংকর। সোনামুখী কলসী থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে কিংকরের মুখের কাছে ধরল। কিংকর এক নিশ্বাসে জলটুকু পান করে চোখ বুজল। বন্ধ চোখ থেকে একটা ফোঁটা সোনামুখীর চোখকে আড়াল করে অতি সন্তর্পণে নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। ক্ষীণকণ্ঠে কিংকর বলল, "এ-জনমে আমার ফলার করা হল না রে।" হতবল আহত কিংকরের অতৃপ্ত খেদোক্তি শুনে সোনামুখীর বুক বেয়ে এক শীতল প্রবাহ নামল।

হাঁ করে চোখ বুজে পড়ে থাকা কিংকরের কানের লতিতে জমে থাকা ফোঁটা ফোঁটা রক্ত করুণ চোখে সোনামুখীর দিকে চেয়ে আছে।

তুলসীতলায় জল পেয়ে গজিয়ে ওঠা গাঁদার পাতা থেঁতলে কিংকরের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয় সোনামুখী। কিংকরের বুক ভেঙে এক দীর্ঘশ্বাস পড়ে। পেটের জন্যই দীর্ঘশ্বাসে সোনামুখীর বমনোদ্রেক হ'ল। কিন্তু নিষ্কাষিত না হয়ে সোনামুখীর মনের গভীরে সে গরল ধীরে ধীরে নেমে গেল।

সোনামুখীর সেবাযত্নে ক্ষত শুখলো ; জ্বর ছাড়ল। কিন্তু সাবেকী সে কিংকর আর নাই। নিস্পন্দ গিরগিটির মত একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মুখে হাঁ-চা নাই। সোনামুখী ডাকলে সভয়ে চম্‌কে ওঠে। সোনামুখীর নির্দেশনামা নীরবে মেনে চলে কিংকর! 'চান কব' বললে স্নান করে, 'খেতে এস' বললে খায়।

মৌন কিংকরের নীরবতায় সোনামুখীর একাকীত্বের নির্জনতা মৃত্যুমুখ হিমশৈলের মত বুকের ওপর চলাফেরা করে।

নিঝুম দুপুরে বোঁটায় নামমাত্র লেগে থাকা পাতার মতো দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে কিংকর। মাঠ-ঘাট, কাজ-কাম বন্ধ। শ্রীরামপুরের ইদ্রিশ শেখ মাঝে মধ্যে কিংকরের তত্ত্ব-তল্লাস করে যায়। চাষের কথা উঠলেই অস্থিরভাবে হাই তুলে কিংকর কুঁজিয়ে বলে, "গায়ে জুত নাই হে।"

আষাঢ়ের মাঝামাঝি হয়ে গেল একমুঠো বীজও পড়ল না মাঠে,

ছাঁচ-গড়ানো বৃষ্টিও হ'ল না একদিন। ছানা-কাটা মেঘে কেবল চোঁয়া ঢেকুরের শব্দ।

গত রাতে গা পুড়িয়ে জ্বর এসেছিল কিংকরের। সারারাত চোখের পাতা এক করে নি সোনামুখী, ভোররাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। অনেকটা বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে কিংকরকে ঘরে দেখতে না পেয়ে সোনামুখীর মন তুড়তুড় করে কেঁপে উঠল। এক আতঙ্কিত উল্কাপিণ্ড যেন মুহূর্তে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে সোনামুখীর মনের ওপর চির্‌চির্ ঝরে পড়ল। গভীর অবসাদে সোনামুখী ঘামতে লাগল। চালের বাতায় টিকটিকিটা সময় বুঝে টিকটিক করে ডেকে উঠল।

হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠল সোনামুখী। দেখল, কিংকর টাল-মাটাল দিয়ে বাড়ি ঢুকছে। চোখ পেকে কুঁচ-বরণ; কয়েস বেয়ে লালা। দারুণ যন্ত্রণায় মুখমণ্ডলের শিরা উপশিরা তুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত। চোখের মণি ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মাথা নেড়ে বিড় বিড় করতে করতে উন্মাদের মত ঘরের ভিতরে ঢুকেই কিংকর মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

ভয় পেয়ে সোনামুখী বু-বু করে কেঁদে উঠল। সোনামুখীর গোঙানি শুনে দু-চার ঘর পাড়া-পড়শী ছুটে এল। প্রতিবেশী জিয়ন মোড়ল বলল, "দেখে শুনে ভাল লাগছে না, ভাল করে ক-বার ওর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দাওতো।"

সোনামুখী এক বাটি জল নিয়ে যেতেই আঁতকে ওঠা কিংকরের হাতের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে জলের ঘটি।

একফোঁটা শ্বাসের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে কিংকর। গলবিল ক্রমশ বুজে আসছে, শ্বাস নিতে বড় কষ্ট। এক ফোঁটা লালাও কণ্ঠনালী বেয়ে নেমে আসতে পারে না।

ভিজে হাত দিয়ে কিংকরের মুখ মুছে দিতে গেলে কয়েস বেয়ে পড়া লালায় ভরে যায় সোনামুখীর হাত। মনে হ'ল কিলবিল করে কিছু অভুক্ত কীট ওর হাত বেয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ কিংকরের মুখ থেকে 'ভুক' শব্দ ওঠে। যন্ত্রণায় কিংকর ডাঙায় তোলা কাতলা মাছের মত মাথা আছড়ায়।

ঘরের চৌকাঠের নিরাপদ দূরত্বে থেকে জিয়ন মোড়ল বলে, "যা ভেবেছিলাম, কিংকরের জলাতঙ্ক হয়েছে, জলে কুকুরের ছ্যাঁ দেখে 'ভুক ভুক' করছে। তোরা সব ঘব যা। হঠাৎ যদি কিংকরা কামড়ে দেয়, তোদেরও জলাতঙ্ক হবে।"

আতঙ্কে সাবধানী পড়শীরা কাজ-কামের নামে একে একে সবাই সবে পড়ল। সোনামুখী কিংকরেব কানের কাছে মুখ রেখে বলল, "কিছু খাবে ?"

জবাবে কিংকরের মুখ থেকে একটা "ভুক" কবে শব্দ বেরোল। কিংকরের রাঙা ফোলা চোখ বেয়ে জল পড়ছে, গলগল করে লালা ঝরছে।

জলাতঙ্ক রুগীকে পাহারা দিয়ে অসহায় সোনামুখী একলা বসে থাকে। দুই চোখ বেয়ে শুধু জলের ধাবা। মাঝে মাঝে কিংকর পাগলের মত হাত-পা ছোঁড়ে, ঘর থেকে বেরোতে চায়। কিংকরকে সামাল দেওয়ার মত ক্ষমতাটুকুও যেন সোনামুখী ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। দুপুর গড়াতে চলল, সোনামুখী ঠাই বসে।

সকাল থেকে নির্জলা উপবাসী এঁড়েটি সংযমের বাঁধন ছিঁড়ে আপন প্রাণ বাঁচাতে তৎপর হ'ল। সোনামুখী দরজা ভেজিয়ে পলায়নপর এঁড়েটির পশ্চাৎধাবন কবে! এঁড়ে শিং নেড়ে ফোঁস করে সবুজ ঘাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মাঠের দিকে হাঁটে। সোনামুখী কাছাকাছি হতেই গোঁজ গলায় ঝুলিয়েই ছুটতে সুরু করে। সোনামুখীও পিছু পিছু ধুক ধুক করতে করতে ছোটে, আর পিছন ফিরে তাকায়। বাড়িতে জলাতঙ্করোগী, সামনে পেটের জ্বালায় বেপরোয়া এঁড়ে। কাকে রেখে কাকে সামলায়! উপায়ন্তরহীন জলপিপাসায় কাতর এঁড়ে গরুটি মাঠের মাঝে তালপুকুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

সোনামুখী অপেক্ষা করে রইল, পুকুরে ঢোকার মুখেই শিমূল-

গাছটার তলায়। জলভার মন্থর এঁড়েটির গলার দড়ি ধরে তারই মত ঢিলেঢ়ালা পা ফেলে বাড়ির দিগে এগিয়ে চলল সোনামুখী।

মাঠ-পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকতেই এঁড়েটি গাঁ করে ডেকে উঠল। আতঙ্কে ভরা করুণ সে ডাক শুনে সোনামুখীর ভয়ে ও উত্তেজনায় কেঁপে ওঠা হাত থেকে গরুর দড়ি এলিয়ে পড়ল। ভরতুপুরে বাড়ি ঢুকে সোনামুখীর বুকের রক্ত মুখে উঠেই হঠাৎ কোথায় তলিয়ে গেল।

জলে, কাদামাখা কিংকরের মৃতদেহ ঘিরে পাড়া পড়শী, ছেলে-মেয়েদের হা-হুতাশ। সোনামুখীকে দেখে জিয়ন মোড়লের বৌ হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠল। কেঁদে উঠল সোনামুখীও।

পাঁজরখসা কান্নায় ভরে গেল জৈষ্ঠ্যের দুপুর। অসুস্থ কিংকর কখন পুকুর-ঘাটে গেল ? অমন করে মুখ গুঁজেই বা মরল কেন ? রহস্যময় ধাঁধার আকর হয়ে কিংকরের শবদেহ উঠোনে পড়ে আছে।

শবদেহে লেপ্টে থাকা কাঁচা পাঁক ক্রমশঃ শুখিয়ে আসছে। জিয়ন মোড়ল প্রস্তাব করল, "অপঘাত মৃত্যুর কোন ক্রিয়া-কর্ম নাই। জল থেকে কিংকরার লাশ যখন তুলেছি, আমাকে তো যেতেই হবে। তোরা জনাকতক আমার সঙ্গে আয়। বাড়ি থেকে মড়া না বেরুলে অনেকের বাড়িতে হাঁড়ি চাপবে না। জনাকতক বাশ দড়ির জোগাড়ে যা।"

জিয়নের কথার পাল্টা কথা বলল মুক্তি মোড়ল, বয়স তিন কুড়ি পনের। পাকা চুল, ফোঁকলা-ঝোলা গাল, শিথিল ত্বকে জরার ঢেউ জরজর। বলল, "অপঘাতে মিত্যু বলছিস ক্যানে জিয়ন ? আমার বয়েস হয়েচে, কিংকরাকে জীবদ্দশায় বড় একটা দেখতে পেতাম না, তাই একবার চোখের দেখা দেখতে আসচি। এখন যদি আমি কিংকরার মত ছাঁচতলায় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে মরে যাই, তা'হলে কি আমি আত্মঘাতী হলাম ? আমার ছেলে মুখে আগুন দিতে লারবে ? কিংকরা হয়তো মাথা ঘুরে গাবায় পড়ে গিয়ে থাকবে।"

'পাড়া-পড়শীর চোখ শবদেহের উপর ন্যস্ত থাকলেও কান সতর্ক ছিল বিতর্কে। জিয়ন বলল, "তোমার মরণের কথাটো মরলে ভেবো,

এখন মরলে দুটো লাশ নিয়ে আমরা হিমসিম খাব।" জিয়নের কথায় অনেকের চোখের জলে হাসির ছটা ফুটল। "কিংকরার কোন ছেলেপিলে নাই, ওর বৌ যদি মুখে আগুন দিতে চায় তো দেক, আমরা মানা করব না।"

জিয়ন মোড়লের বৌ-এর কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সোনামুখী। মুখে আগুন দেওয়ার কথা কানে যেতেই ওর মন হাহাকার করে উঠল। যে-মুখে কোনদিন ভাল-মন্দ তুলে দিতে পারে নাই, সে-মুখে আগুন দেব কোন্ অধিকারে? "না, না," বলে ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাল সোনামুখী।

বৃদ্ধ মুক্তি মোড়ল কিংকরের প্রেতযোনি প্রাপ্তি নিশ্চিত জেনে হঠাৎ মৃত্যুভয়ে অধীর হয়ে লাঠির ওপর ভর দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এক সময় হরিধ্বনি দিয়ে কাঠুরীরা কাঁচা বাঁশের চতুর্দোলায় কিংকরের শবদেহ কাঁধে করে বাড়ি খালি করে চলে গেল।

অপঘাতে মৃত্যু বলে দাহ করা হ'ল না। কোমরের চাবকি ছিঁড়ে দিয়ে কোমর-ভর গর্ত করে কিংকরকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল ময়ূরাক্ষীর চড়ায়।

শাঁখা ভেঙে, সিঁদুর তুলে থান কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে বিধবা সেজে বা'র দরজায় এসে নিমপাতা চিবিয়ে আগুনে হাত সেঁকে বাড়ি ঢুকে উঠোনে পা দিতেই সোনামুখীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। কিংকরের গায়েব গন্ধ যেন ভেসে বেড়ায় উঠোনেব আনাচে কানাচে। ছমছমিয়ে উঠল ওর মন।

এমন সময় জিয়ন মোড়লের বৌ এক গ্লাস সরবৎ এনে সোনামুখীকে বলল, "সরবৎ টুকুন খা।" কণ্ঠনালী ফেটে ছিল তৃষ্ণায়। সোনামুখী সরবৎটুকু চোঁ চোঁ করে পিইয়ে খেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও আটকে গেল বুকের মাঝপথে।

সন্ধ্যা জেলে দিয়ে রাতে শোওয়ার জন্য একটা তালাই পেড়ে, মাথার গোড়ায় এক ঘটি জল নামিয়ে দিয়ে জিয়ন মোড়লের বৌ বলল, "সব ঠিকঠাক করে রাখলাম। বসে আর থাকিস না, একটু শো। আমি চললাম।"

শূন্যমনা সোনামুখীকে গ্রাস ক'রে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে তাকিয়ে দেখে সোনামুখী, শুধু নিরবচ্ছিন্ন বোবা অন্ধকার।

কিংকরের মুখই মনে পড়ে সোনামুখীর। ওর মত সোনামুখীর কোলে মাথা গুঁজে আর কেউ বায়না ধরবে না, "সোনামুখী, বড় ক্ষিদে লেগেছে রে," বলে কেউ লাঙ্গল কাঁধে মাঠ থেকে ফিরবে না। গভীর রাতে ঘুম না এলে ওর চুলে হাত বুলিয়ে কেউ আর ঘুম পাড়াবে না। বেঁচে থাকতে কিংকরের জন্য এত মন খারাপ করে নাই, এমন করে তার অভাব অনুভব করে নাই সোনামুখী। ভালমন্দ খেতে চেয়েছে বলে কত মুখঝামটা-ই না দিয়েছে সোনামুখী। একফোঁটা চোখের জল অন্ধকারে ঝরে পড়ে সোনামুখীর চোখ থেকে।

সময় গত হয়, সোনামুখীর শূন্যতা নির্জন বাড়িকে ঘিরে ঝুলে থাকে। স্নায়বিক অবসাদে গা এলিয়ে একাকী উনোন-শালে গালে হাত দিয়ে ঠাঁই বসে বসে ভাবে। আগুন জ্বালতেই ভুলে যায়।

এঁড়েটি ডাকবাংলার হাটে জিয়ন মোড়ল বেচে এসেছে। একজোড়া থান কাপড়ের দাম মিটিয়ে হাতে যা ছিল তা' দিয়ে মণ দুই ধান সংগ্রহ করে সোনামুখীর বাড়ি পেঁৗছে দিয়েছে ; হাতে নগদ যা পেয়েছিল তা' থেকে ময়দা, আড়াইশো মত গাওয়া ঘি, পোয়াটেক আতপ চাল বাড়িতে এনে রেখেছে, সোনামুখী মৃত স্বামীর উদ্দেশে ভোগ দেবে বলে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেন খুন্‌খুন্‌ করে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরছে, মাঝে মাঝে গায়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে কে যেন সরে যায়। বুকের ভেতর পাথরটা যেন আরও চেপে বসে। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। কিংকরের অতৃপ্ত বাসনার সৎকার না হ'লে সোনামুখীর মুক্তি নাই। নাই, সে কথা সোনামুখীও জানে ; কত দিনে. শুধু তা' জানে না।

আড়িমুড়ি ছেড়ে হাঁকডাক করে আষাঢ়ের মেঘ চোঁয়া ঢেকুর তুলে এলোমেলো উড়ে গেল। গুমগুনি গরমে বিষিয়ে উঠল মাঠ-ঘাট।

শ্রাবণের জন্মলগ্নেই পুঞ্জীভূত হ'ল মেঘ। অবেলায় কালো মেঘে ঢেকে গেল ঝিলেরা গ্রাম, মাঠ, ঝলসে ওঠা নীল আকাশ।

ময়ূরাক্ষীর বালুচরে ছটফটিয়ে খৈ-ফোটা হয়ে নামল বৃষ্টি, সঙ্গে উথাল-পাথাল ঝড়। মাটিতে কপাল ঠোকে বাঁশবন। মড়মড় করে একটা মড়া তেঁতুল-ডাল ভেঙে পড়ল উঠোনে। বিদ্যুতে ঝলসে গেল সোনামুখীর চোখ; কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল কোথাও। সোনামুখী চোখ বুজতেই ভেসে উঠল জল-ঝড়ে আহত কিংকর আলপথে টলে টলে পড়ছে। ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল মন। সোনামুখী উঠে পড়ল।

অবিশ্রান্ত জলধারাকে অগ্রাহ্য কবে গোয়াল থেকে শুকনো কাঁচকি বের করে উনুন ধবিয়ে সোনামুখী অপঘাতে মৃত কিংকরের পারলৌকিক রসনার সৎকারে লুচি-পায়েস তৈরি করতে বসল। তখনও সামনে বৃষ্টি পড়ছে। ঘিয়েব ময়ান দিয়ে সুন্দর করে লুচি ভেজে, পায়েস রেঁধে জলেভেজা ফোসকা-ওঠা মেঝে হাত দিয়ে মুছে একটা চাটাই পাতল। এক গ্লাস জল ঢেলে লুচি-পায়েস নিবেদন করে গলায় কাপড় জড়িয়ে কিংকরের মৃত আত্মাকে আহ্বান করে সোনামুখী বলল, "ওগো খাও, তিপ্তি করে খাও।" বলতে বলতে সোনামুখীর দুচোখ ভিজে উঠল।

এমন সময় বার দরজার কাছে 'ভুক্' করে একটা শব্দ হ'ল। ফড়িং-এর ডানার মত সোনামুখীর কান জোড়া এক সঙ্গে খাড়া হয়ে উঠল। আবার সেই আওয়াজ! না, কোন ভুল নাই, অবিকল সেই ডাক; ভয়ে-আনন্দে শিউরে উঠল সোনামুখী। তবে কি ও এসেছে? সোনামুখী প্রত্যুত্থান করে বার-দরজার হুড়কো খুলতেই দেখল জল-ঝড়ে ঘা-খাওয়া, ছাল-ওঠা কৃশাঙ্গ একটা নেড়ী কুত্তা চৌকাঠের কাছে কেঁউ কেঁউ করে অসময়ে আশ্রয়ভিক্ষা করছে। অসহায় কুকুরটির দিকে অপলকনেত্রে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সোনামুখী মনে মনে বলল, "অত

কাকুতি মিনতির কী আছে? রূপ পাল্টে আর যাকে দেবা দাও, তোমার সোনামুখীর চোখে ধূলো দিতে পারবা না।" কুকুরটিকে ইঙ্গিতে বরাভয় জানিয়ে ত্রস্তে ঘর থেকে লুচি-পায়েস এনে থালাবাটি-সুদ্ধ কুকুরটির সামনে নামিয়ে দেয় সোনামুখী।

কুকুরটি অবাক হয়ে একবার পরমান্ন-দাত্রীর দিকে অন্যবার পরমান্নের দিকে চায়।

কুকুরটির ইতস্ততঃ ভাব দেখে সোনামুখী প্রসন্ন-কণ্ঠে বলল, "কই খাও, তিপ্তি করে খাও, এসবই তোমার সোনামুখীর হাতের রান্না।"

বেশীক্ষণ লোভ সংবরণ করা শালীনতা-বিরোধী বিবেচনা করে লেজ নাড়িয়ে কুকুরটি নিমেষে চপ্ চপ্ করে লুচি-পায়েস সাঁটিয়ে রীতিমত চাঙ্গা হয়ে উঠল। নাকে-মুখে লেগে থাকা পরমান্নটুকু জিভ দিয়ে চেটে খেতে খেতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সোনামুখীর দিকে চেয়ে লেজ নাড়াতে লাগল। সারমেয়-জীবনে অযাচিত পরমান্ন লাভের বিস্ময় ও আনন্দ যুগপৎ ফুটে ওঠল ওর লাল দুই চোখে।

বৃষ্টি থেমেছে। পশ্চিম আকাশে ডালিম-ফাটা রাঙ্গা রোদ ময়ূরের মত পেখম মেলে বসেছে। শ্রাবণ-সন্ধ্যার আলো মেখে কুকুরটি ধীরে ধীরে গ্রামের পথে মিলিয়ে যায়। অপস্য়মান কুকুরটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোনামুখীর বুকে জমে থাকা পাষাণ গলে যায়; তৃপ্তিতে ভরে আসে মন। সোনামুখীর দু-ফোঁটা চোখের জল আলোর বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ল মাটিতে।

পুরন্দরপুরের ডায়ার সাহেব

পুরন্দরপুর থানার জবরদস্ত দারোগা দীনেশ রায় ওরফে জেনারেল ডায়ার-মাথা ভরা টাক, হাড়গিলে পাখীর মত ঠ্যাঙা চেহারা, স্থানীয় বিধায়ক রজত-জানার উপস্থিতিতে তার সামনের দেওয়ালে টাঙানো জেলা মানচিত্রের একটি কোন্ লাল কালিতে শেষ ক্রশ চিহ্ন সংযোজিত ক'রে ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন—'খতম !'

প্রতিধ্বনি আক্রান্ত বিধায়ক কর্ণে আতঙ্কের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হল। আঁতকে ওঠা এম. এল. এ-র কাঁধের একজিমা ঘা কুটকুট করে উঠল বেলা বারোটায়।

'খতম্' শব্দটির তাৎক্ষণিক তাৎপর্য অনুধাবনে তৎপর বিধায়ক।

দারোগাবাবু নিজের চেয়ারে বসে স্বমহিমায় প্রকটিত হলেন। তর্জনী অঙ্গুলীর সাহায্যে অপত্যস্নেহে বাবুই ঝোঁপা জমকালো দুই গোঁফ জোড়ায় সুড়সুড়ি দিতে দিতে বললেন, "নকশাল খতম্। আজ সকালেই খবর এসেছে পাটনীল থানার শেষ তিন উগ্রপন্থী পীত-স্বর্গে গমন করেছে।"

অভুক্ত-উদর বিধায়কের চোখে সরষে ফুলের শোভাযাত্রা। রজতবাবুর নির্বোধ দৃষ্টিকে বোধদান করার নিমিত্ত বড়বাবু দীনেশ রায় বললেন, 'কি মশায়, পীত-স্বর্গ কথাটা কেমন কয়েন করেছি বলুন তো।

বিধায়ক ভাষাহীন—নিরুত্তর।

"মহাকাশ ভাগাভাগি হচ্ছে, তাহলে শত-কোটির দেশ চীনের ভাগেই বা স্বর্গের কিয়দংশ পড়বে না কেন ?" দ্রুত স্বর্গ বিভাজনে অপারগ বিধায়কের মস্তক—জলে জেগে থাকা বোবা ফত্‌নার মত বামে ডানে কোন দিকেই হেলে না।

"ভাবের বীজ তো বাতাসে ওঠে, কামান বন্দুকে আটকানো

যায় না, কিন্তু ঐ ভেসে-আসা বাণী যদি জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলে, ঘরে ঘরে বিপ্লবীর জন্ম দেয়, জনগণকে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করে, তা হলে আমরা করবো কি ? বাণীর বরপুত্রদের হাতে কামান বন্দুক তুলে দিয়ে সাক্ষীগোপাল সেজে হামাগুড়ি দিয়ে মা যশোদার ননী-চুরি করতে বেরবো ?" সদুত্তরদানে অপারগ বিধায়ক অস্থিরভাবে একবার মাথা ঝাঁকা দিলেন।

"আপনি তো রাজনীতি করেন, বলুনতো আমাদের ঐতিহাসিক অবদান কি ?"

দারোগাবাবুর ধমকের ধাক্কায় জনপ্রতিনিধি নিজ ভাবমূর্তির ভাঙন রোধ কল্লে তার পৌর-বিজ্ঞানের পয়ঃপ্রণালী ছেঁচে জ্ঞানামৃতটুকু সংক্ষেপে নিবেদন করে বললেন, 'শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা।' উত্তরশ্রবণে অসুখী বড়বাবু তার সামনের দেওয়ালে টাঙানো মহাত্মা গান্ধীর ফটোর দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে তাঁর সুগন্ধী টাকে হাত বেলোতে বোলাতে বললেন,'এহ বাহ্য—যা কেও পারে না, পুলিশ-ই তা পারে।

কৌতুহলী রজতবাবুর চোখ জোড়া কক্ষচ্যুত হবার উপক্রম।

"আমরা অনায়াসে অমরত্ব দান করি, আমাদের বন্দুকের নল থেকে একটা জলন্ত বুলেট—আপনার মত যে কোন একজন রাজনৈতিক কর্মীকে রাতারাতি শহীদ বানাতে পারে। মালা চন্দনে ভূষিত হয়ে, অমর শহীদ আমরা তোমায় ভুলছি না, ভুলবো না মন্ত্রে অভিনন্দিত হয়ে কয়েক বছর ধূপ ধুনো পেতে পারেন।" থানার দারোগার এক টানা বক্তৃতা সৌজন্য সীমা অতিক্রম করলেও সাংবিধানিক রাজনীতিতে ভুঁতিয়ে যাওয়া বিধায়ক রজতবাবু অমরত্ব লাভের আশঙ্কায় বাক্‌সংযম করাই শ্রেয় জ্ঞান করলেন। এবং আড়চোখে বড়বাবুর দিকে এক নজর তাকিয়ে মাথা হেঁট করে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—লোকের মুখে শোনা কথাটাতো মিথ্যে নয়। সাধারণ মানুষের সৃজনীশক্তির তারিফ না করে উপায় নেই। অনায়াসে অনাবিল সত্য এত সরস-সরল করে কেও বলতে পারে না,।

বড়বাবু দীনেশ রায়কে জেনারেল ডায়ার খেতাব দানের মধ্যে তা প্রতীয়মান।

আর সত্যিই, ঢেউহীন ধীর স্থির জলাশয়ের মত সমগ্র পুরন্দরপুর থানা চুপ-চাপ, ফিস-ফাস, গরমে রাঘব বোয়াল তো দূর স্থান ফিঁচেল ছুঁইও আঘাটায় মানুষকে ঠুকরে দিতে সাহস পায় না !

ইকবালপুরের লালু শেখ মস্থণ দেওয়াল বেয়ে অনায়াসে কাঠ-বিড়ালীর মত ছাদে উঠে যায়—সেও ডায়ারের বিষে জ্বর-জ্বর, নামাজ পড়ার সময় হলে পার্টির মিটিং ছেড়ে মসজিদে যেতে একদণ্ডও দেরী করে না।

শান্তি রক্ষা করতে করতে বড়বাবুর অরুচি দেখা দিলে মাঝে মধ্যে এক আধ বোতল সুরা-সার গ্রহণ করেন। সেদিন পাতি দারোগার পেটি যেন আপনা আপনি খসে পড়ে। তখন হাড়গিলে টেকো মানুষটা থেকে এক হিংস্র শ্বাপদ আত্মপ্রকাশ করে, জেনারেল ডায়ার যার নাম। ওঠা-বসা, চলা-ফেরা ত্রস্ত কথা-বার্তায় তখন তার জুড়ি মেলা ভার। ডায়ারের হিংস্র কুটিল সে চাহনীর মোকাবেলা করে কে ?

গোঁপে তা দিতে দিতে হান্টার হাতে বন্দী কয়েদীর দিকে তামাটে চোখে সাক্ষাৎ শনির মত যখন ডায়ার সাহেব এগিয়ে যান, তখন অতিবড় পালোয়ানের বুকের কলিজার খুন পানি হয়ে আসে। কয়েদীদের সামনে সগর্জনে জনগণের দেওয়া খেতাব অনুমোদন করে।

তবুও বাবলা গাছে ফুল ফোটে। সে ফুল ফোটা দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না, মেজবাবু, রাম সিং-এর মত কয়েকজন ঘরের লোক ছাড়া। দেদার-দিল বড়বাবু মদের তুফান ভেঙে পান্‌সী নৌকায় যে দিন প্যাড়ি জমান খোস-দরিয়া দিল বড়বাবু সেদিন হয়ে ওঠেন বাঞ্ছাকল্পতরু। হুজুর মা-বাপ বলে স্মরণ নিলে অক্লেশে বড়বাবু ত্রি-তাপ জ্বালা জুড়িয়ে দেন। তবে সে দাক্ষিণ্য হজম করা বড় কঠিন।

সাত-পাঁচ ভাবনায় রজতবাবুর মন খুঁড়িয়ে হাঁটলেও তিনি তাঁর আগমনের কারণটি অমরতার ঠিকাদার দারোগাবাবুর কাছে পেশ

করতে সংকোচ করছিলেন। এম. এল. এ. হয়ে একি উট্‌কো ঝকমারীতে পড়েছেন। কথায় আছে, —

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,
বিপদ হল বড় এঁড়ে গরু কিনে।

যে দিন থেকে রজতবাবু জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, সে দিন থেকেই সুরু হয়েছে তাঁর জনগণের সঙ্গে ব্যবধান। বছরে পাঁচমাস কোলকাতার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সরকারী খামারে হম্বি-তম্বি নিষ্ফল আস্ফালন, প্রতিশ্রুতি, আর মাঝে মাঝে কর্তার ইচ্ছায় বোতাম টেপা, কখনও মাস্‌ল ফুলিয়ে অন্যদলের দিকে তেড়ে যাওয়া, আবার কখনও কখনও বুফে ডিনারে হ্যাংলার মত হপ-হপিয়ে খাওয়া। রজতবাবু নিজেকে ডেকে সাড়া পান না, গলা থেকে কেবল দলীয় সুর বের হয়। নিজের গলার স্বর ভুলে যান, দাবার ছকে বাঁধা সময়। সরকারী-বেসরকারী ও দলীয় আমলাদের ঘরে ঘরে পা ফেলে ফেলে সন্তর্পণে চলা-ফেরা।

মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন রজতবাবু, সময় সময় দলের আদেশ মেনে চলতে মন সায় দেয় না। বিশ্বাস করে কোনো কমরেডকে বললে তারা প্যাঁচার মত বিজ্ঞ চালে তাঁর ভুল সংশোধন করে বলেন, "কমরেড, বিবেক বলে বস্তুটি হল আপনার পাতি বুর্জুয়া আব, আর ওটা অপারেশন না করলে তো আপনি স্বার্থক বিপ্লবী হতে পারবেন না, পাতি ব্যক্তি-বিবেক উৎখাত করুন। কোনো সংগ্রামে সামিল হওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব।" এরপর কথা বাড়ানো ভাল নয়। বিবেকের বিরুদ্ধেই আজ তাঁকে দাবোগাবাবুর উমেদারী করতে আসতে হয়েছে। দলের প্রভাব ও পরিধি বিস্তারে মানুষ খুন এখন অনুমোদন যোগ্য।

বিবেকের বিড়ম্বনার তাড়নে জ্বর-জ্বর উপায়ন্তরহীন বিধায়ক অবশেষে হাঁ করতেই বড়বাবু সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে বললেন, "মাফ করবেন।"

"আহা ব্যাপারটা শুনুন"—বিধায়ক দুর্বল কণ্ঠে নিবেদন করলেন,

"জানি, জামিন হবে না। আপনাদের মশায় বলিহারী যাই, জল-জ্যান্ত খুনের আসামীর হয়ে জামিন চাইতে এসেছেন।" বিধায়কের ব্যক্তিত্বের স্নায়ু শিথিল হয়ে যায় তবুও আমতা আমতা করে বলেন রজতবাবু,—"ডি. এস. পি-র সঙ্গে কথা বলেছি, আপনি রাজী হলে ওনার কোন আপত্তি নাই।"

সুগন্ধী টাকে হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে বড়বাবু বললেন, "খুনীর জামিনদার আপনি হবেন কেন? এসব কাজ তো থানার টাউটরা করতো! তাছাড়া খুন করার সময় ওরা কি জনপ্রতিনিধির সম্মতি নিয়েছিল?"

দারোগা বাবুর প্রত্যক্ষ প্রত্যাখ্যানে বিধায়কের স্তিমিত বিবেক ভিতর ভিতর গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। দারোগাবাবু পবিত্র সংবিধানের সীমারেখা লঙ্ঘন করছেন কোন্ অধিকারে!

শ্লেষাত্মক কণ্ঠে রজতবাবু বললেন, "আসামী বলে চালান দেওয়াটা আপনার এক্তিয়ারভুক্ত, তাই বলে আপনি তাকে প্রকাশ্যে খুনী বলে ঘোষণা করতে পারেন না। আপনি তো মশায় দেখছি বিচারককেই চালান দিয়ে নিজেই তার আসনে বসে পড়তে চাইছেন।"

বিধায়কের কথার কশাঘাতে বড়বাবুর টাক্ গরম হয়ে উঠল। রুক্ষ-স্বরে মাথা নেড়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বড়বাবু বললেন, "ভুল করছেন রজতবাবু, আমিতো বলিনি, আপনিই তো আমাকে বিচারকের আসনে বসাচ্ছেন। কোর্ট কাছাড়ী করবে বিচার, জজে দেবে রায়, আমার কাছে এলেন কেন? আমি নিরুপায়!" বড়বাবুর সওয়াল শুনে রুদ্ধবাক রজতবাবু জ্যৈষ্ঠ মাসের ভর দুপুরে থানায বসে ঘামতে লাগলেন। থানা-উঠানে একটি ফুলন্ত নিমগাছ থেকে একটি ঘুঘু পাখি 'ঘুঘুর ঘু ঘুঘুর ঘু' করে ডেকে চলছে।

এমন সময় মাথায় ছাতা গায়ে পাঞ্জাবী নাদুস নুদুস কালো এক ভদ্রলোক ঘেমে-ঘুমে একাকার হয়ে থানায় ঢুকে সম্মুখে নিবিষ্ট-চিত্ত দারোগাবাবুর ধ্যান ভঙ্গ করে হাঁও-মাও করে কেঁদে উঠে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। ভদ্রলোকের হাতে ধরা একটি খাম,

কান্নার দমকে দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল ওনার নাদুস নুদুস ভুঁড়ি। বড়বাবু ধোঁয়া ছেড়ে পদাশ্রিত বলী মধ্যম বয়স্ক হামিদপুর নিবাসী ধনী আড়ৎদার গদাধর গনাইকে উঠে দাঁড়াতে আদেশ করলেন।

কান্নার ছড় মাডুলি দিতে দিতে হাপুস নয়ন বেহুস গদাধর মেঝেতেই বসে পড়ে বেসুরো গলায় বলতে লাগলেন—'হুজুর, ধনে প্রাণে মরে যাব হুজুর, আমাকে বাঁচান। এই দেখুন চিঠি, কি লিখেছে দেখুন।'

বড়বাবু বললেন, 'কান্না থামিয়ে কি লিখেছে পড়ুন।'

বিস্ফারিত নেত্রে রজতবাবু তাঁর আসামীর জামিনের কথা বেমালুম ভুলে দারোগা বাবুর নূতন রঙ্গ দর্শনে তৎপর হয়ে উঠলেন।

কোঁচাব খুঁটে চোখটি মুছে ক্রন্দন-ক্লান্ত কণ্ঠে গুণধর গনাই পত্র পাঠ সুরু করলেন,—"পত্র পাঠ টাকা কড়ি সোনা দানা সব গুছিয়ে রাখবেন, আগামী ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিবেলা যে কোন সময়ে আপনার বাড়ীতে উপস্থিত থাকবো। পুলিশে খবর দিলে আপনার পুত্রের মুণ্ড বর্দ্ধমানের জি. টি. রোডে গড়াগড়ি দেবে। নকশালবাড়ী লাল সেলাম।"

চিঠির বিষয়বস্তু শুনে বিধায়ক ললাটে বিস্ময়, আতঙ্কের ঢেউ ওঠা-নামা করতে থাকল। "হুজুর আমার মুণ্ডুর দায়িত্ব নেন, হুজুর।"

'স্টপ ইট' বলে বড়বাবু অফিসে প্রবেশরত মেজবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেখুনতো মিস্টার বোস ১৯শে জ্যৈষ্ঠ কি বার পড়ছে।' মেজবাবু ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাবার আগেই হায় হায় করে বলে উঠলেন গনাই মশায়—'আজই ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।'

সাহস সঞ্চয় করে মুচকি হেসে রজতবাবু বললেন, 'কি বড়বাবু, কিছুক্ষণ আগেই না আপনি নকশালদের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করলেন, ল এ্যাণ্ড অর্ডার বেশ ভালই।'

আপন দক্ষতার প্রতি কটাক্ষে উত্তেজিত দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'ইয়েস, ইট ইজ ভেরি গুড!' গুণধরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ডোণ্ট ওরি, গো হোম গনাইবাবু, নকশাল টকশাল

ওরা কেও নয় পাতি চোরের কারবার—আপনার সঙ্গে তামাশা করেছে।”

“তামাসা নয় হুজুর, একদিন ওদের কথা পেটে চেপে রেখে আমার আমাশা ধরে গেল” বলে গুণধর পুনরায় কাঁদবার উপক্রম করল।

“বললাম তো, আর শ্মশান-কান্না কাঁদতে হবে না—বাড়ী যান।”

নাছোড়-বান্দা গুণধরের ভয় কাটে না, বলে—“যদি ওরা আসে তখন কে বাঁচাবে হুজুর।”

সামান্য একটা দারোগাকে সারাক্ষণ হুজুর হুজুর করাটা বিধায়ক রজতবাবুর রুচিকর ঠেকল না; গুণধর গনাইকে খামোকা ধমকে উঠে বললেন, “চুপ করুন তো মশায়, এটা কি মগের মুল্লুক, উড়ো চিঠি দিয়ে ডাকাতি করে চলে যাবে?”

এম. এল. এ.-র কথায় কোনো আমল না দিয়ে ভাঙা গলায় গনাই মশায় বড়বাবুকে জোড়হাত করে বলল, “মান খাতিরের অভাব হবে না হুজুর, শুধু প্রাণে বাঁচান।”

বড়বাবু একবার গুণধর, একবার রজতবাবুর দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করে মেজবাবুকে আদেশ দিলেন—“অর্জুন সিং আর শ্যামাচরণ আজ রাত্রে, গুনধর গনাই-এর বাড়ী চৌকি দেবে। প্রত্যেকের নামে তিনটে করে কার্টিজ এণ্ট্রি করে রাখবেন।”

কৃতজ্ঞতায় গদগদ গুণধর সাষ্টাঙ্গে দারোগা বাবুকে প্রণাম জানিয়ে, বিধায়কের দিকে একবারও দৃষ্টি বিনিময় না করে, চোখ মুখের ঘাম জল মুছতে মুছতে থানা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠবার আগে দারোগা বাবু রজতবাবুকে বললেন, “স্যরি, মিস্টার জানা, আইনের ছকে পা ফেলে চলি, বে-আইনী কিছু করতে পারবো না” বলেই অফিস ছেড়ে চলে গেলেন বড়বাবু।

প্রত্যাখ্যাত পরিত্যক্ত বিধায়ক অসহায় চোখে মেজবাবুর দিকে তাকালেন। মেজবাবু সে চাহনীর উত্তরে সংক্ষেপে রজতবাবুকে বিদায়

জানিয়ে বললেন, "আপনি বরং দু'চার দিন পরে আসুন, আমি বড়বাবুকে একটু ভিজিয়ে রাখব।"

মুখে মলিন হাসি ফুটিয়ে রজতবাবু বললেন, 'আচ্ছা'। তারপর থানা ছেড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

থানার সামনে টাঙানো পিতলের ঘড়িতে টং টং করে লোহার হাতুড়ি মেরে রামসিং কনেস্টবল বেলা চারটে বাজাল।

আইন মোতাবেক সই সাবুদ সেরে শ্যামাচরণ জানা ও অর্জুন সিং বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে, পাশের দোকান থেকে পান চুন সংগ্রহ করে গুণধর গনাই-এর ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করতে হামিদপুর রওনা হল।

পুরন্দপুর ছাড়িয়ে যখন ওরা পূর্ব মাঠে পড়ল তখন পশ্চিমাকাশের দগ্‌দগে সূর্যরশ্মি ওদের পিঠে সোজাসুজি এসে পড়ায় ওদের কালো কালো ছায়াগুলি দীর্ঘতর হয়ে উঠল।

আউটডোর ডিউটি পড়ায় ওরা দুজনেই মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট। বৃহস্পতিবারের বারবেলা। পঞ্জিকা খুললে হয়তো আরও কোন বড় বিপত্তির দেখা মিলত।

অর্জুন সিং অনেক কষ্টে তুলসীদাসের রামায়ণের দু লাইন—
"সুখছাম রূপধারী সিয়াহি দিখাওয়া বিকটরূপধারি লঙ্কা জারাব।
ভীমরূপধারি, অসুর সংহারে, রামচন্দ্রকে কাজ যওয়া রে"—সুর দিয়েছিল। আজ হাট-জন বাজারে রামনামের সভায় তার মূলগায়েনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা, তার বদলে রুটমার্চ করে চল হামিদ-পুর—গুণধর গনাই-এর বাড়ী কুত্তাকা মাফিক পাহারা দিতে—হায় রাম!

হারিশে হায়রান শ্যামাচরণের চরণ আজ উঠতেই চাইছিলো না। হাটে কেনা পাউসের মাগুর মাছের ঝাল অম্বল, গরম গরম ভাত—হায় কেষ্ট! তাও বরাতে জুটল না। বড়বাবুর আদেশ অমান্য করাও অসম্ভব।

চড়া রোদে ঘামে ভিজে শ্যামাচরণের খাঁকির সার্ট পিঠে লেপ্টে গিয়ে কুট কুট করছিল। ডান হাত দিয়ে জামার কলার ধরে টেনে

পিঠে সাঁটা সার্ট সরাতে সরাতে ভুঁড়ি বাহার অর্জুন সিংকে বলল—
"দেখ অর্জুন, উধার উহাঁ খেতকী উপর বিরাট বিরাট ছায়া দেখছিস্ না ; আগর ওইসা পরছাই হতে তব তো আমরা পৌঁহুচ যেতাম।"

অর্জুন সিং শ্যামাচরণের প্রস্তাবে তাৎক্ষণিক সম্মতি জানিয়ে বলল, 'দেখ্ শ্যামা তেরা বাত্ ঠিক আচে। থোড়া আপনাকো লম্বা কর, জলদি সে পৌঁছ যানা।"

সশ্লেষে শ্যামাচরণ চলতে চলতে বলে, "তোর মাথামে কাঁঠালকা আমসত্ত্ব হ্যায়, ক্যাইসা নিজেকে লম্বা করেগা বাবা. জুতিয়ে ?"

'দেখ্ এ্যাইসা' বলে অর্জুন সিং কাঁধের বন্দুক দুহাতে ধরে আকাশে তুলল। তার ছায়া গিয়ে মিশল অবন্তীর ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বটগাছের কোলে।

পথশ্রান্ত শ্যামাচরণের পরনের হাফ প্যান্ট ঢিলে হয়ে কটিচ্যুত হবার উপক্রম। কপালের ঘামে ভেজা অর্জুন সিং-এর ডবডবে ভুঁড়ি হাপরের মত ওঠা নামা করছে। অবসন্ন অপরাহ্নে খাঁ খাঁ মাঠে বট গাছের নীচে অবশেষে দম ছাড়ল দুই লড়াকু সিপাই। তারপর কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে প্যান্টসার্ট ঝেড়ে ঝুড়ে পরে বটবৃক্ষ ছায়ে অঙ্গ জুড়িয়ে পুনবায় কাঁধে বন্দুক তুলে নিল। অবেলায় কাকের ঠোকর খেয়ে একটি হনুমান গাছ থেকে ওদের সামনে লাফিয়ে পড়তেই ভয়ে অর্জুন সিং-এর বন্দুক স্কন্ধচ্যুত হল। অপ্রস্তুত হনুমানকে দুহাত জুড়ে অর্জুন সিং প্রণাম করে মনে মনে রামায়ণ গানে অংশ গ্রহণ না করা জনিত ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করল।

শ্যামাচরণ সন্ত্রস্ত অর্জুন সিং-এর পিঠে থাবড়া মেরে তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, "মাৎ ডরাও ভাই, উগ্রপন্থীকা সাথ যুধ নেহি হোগা। বল, পবন-নন্দন হনুমানজী কী জয়।"

হুনুমানজীর জয় ঘোষণা করে ঠিক সন্ধ্যাবেলা শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং হামিদপুর গ্রামে উপস্থিত হল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, চারদিকে ঝিঁ-ঝিঁর ডাক, অর্জুন সিং-এর গা ছম-ছম করতে লাগল। ক্রমাগত বাঁয়ে-ডানে ঘুরে অবশেষে ওরা অকুতস্থলে উপস্থিত হল।

হ্যারিকেন হাতে অপেক্ষমান গনাই মশায় সাদর সম্ভাষণে বরাভয়-দানকারী শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং-কে আপ্যায়ন করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন এবং বাহির দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন।

প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় বিঘে দেড়েক জমির উপর গনাই-মশায়ের প্রকাণ্ড বড় মাটির দোতলা বাড়ী, গোয়ালঘর ও বৈঠক খানা। পশ্চিম দুয়ারী বৈঠকখানার মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা, এক ঘড়া পানীয় জল, একটি জগ ও দুটি গেলাস বর্তমান।

থানা থেকে পুলিশ আসার সংবাদ পেয়ে সাধন দফাদার সূর্য ডুবতেই গনাই মশায়ের বাড়ীতে হাজির। থানার লোকজন গ্রামে এলে তাদের বিশ্রাম ও উদর বিনোদনের যথাযথ ব্যবস্থাদির ভার তো তারই উপরে বর্তায়।

সন্ধ্যে হলেই চোলাই টানা সাধনের নিত্যকর্ম পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। শুভকাজে বিলম্ব হলেই মুরগীর পায়খানা করার মত পিক ফেলতে সুরু করে সাধন।

শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তার পিক ফেলা বন্ধ হয়। এবার আয়োজনের পালা বন্দুক না নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসতে না বসতে গনাই মশায় দু'থালা গুড়-মুড়ি নিয়ে হাজির।

গুড়মুড়ির দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে শ্যামাচরণ সাধনের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। সাধন তাড়াতাড়ি গনাই মশায়কে আড়ালে ডেকে নিয়ে কি যেন বলল। অপ্রস্তুত গনাই মশায় গলা ঝেড়ে বললেন, 'গুড়-মুড়িতে হাত দেবেন না, সব ব্যবস্থা হবে।'

লুচি রসগোল্লা সাঁটিয়ে হারিশের যন্ত্রণা ভুলে খোস মেজাজে আসামী ধরার খাসগল্প বলতে বলতে হঠাৎ শ্যামাচরণের খেয়াল হল দফাদার সমেত তারা মাত্র তিন জন লোক বৈঠক খানার পিড়েতে বসে আছে।

হ্যারিকেনের অপর্যাপ্ত আলোয় সম্ভাব্য ডাকাতিব মোকাবেলা কঠিন সাপেক্ষে শ্যামাচরণ, সাধনকে হেঁকে বললেন, "দফাদার, একি কাণ্ড, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডাকাত পড়বে, গুলি চলবে, অন্ধকারে

এসব হবে কি করে, হ্যাজাক জ্বালাও। সবেতো জলখাবার হলো, এরপর রাতের ভোগ 'রাগের ব্যবস্থা কর।"

মুখে খৈনী পুরে প্রসন্ন কণ্ঠে অর্জুন সিং বলল, "শ্যামা ঠিক বলত।"

সাধন বাক্যব্যয় না করে অনতিবিলম্বে এক হাতে হ্যাচাক অন্য হাতে দুটি সুপুষ্ট মুরগী ও বগলে দুটি বোতল নিয়ে উপস্থিত হল।

সাধনের কৃতকর্মতার তারিফ করে শ্যামাচরণ লুঙ্গী পরে খালি গায়ে তিল কাঁচকী জ্বেলে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী লড়াইয়ের জন্য শক্তি সংগ্রহের রসদ রন্ধনে ব্রতী হল। অর্জুন সিং লাল আণ্ডার-ওয়ার পরে শ্যামাচরণের তলপেট হয়ে তার রান্নার কেরামতীতে ইন্ধন যোগাতে তৎপর হল।

রন্ধনকার্য সমাপন হলে গনাই মশায় শ্যামাচরণদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করে নিজগৃহে প্রবেশ করলেন।

দেখতে দেখতে গোটা গ্রাম ঘুমে অসাড় হয়ে পড়ল। দীর্ঘ অপেক্ষায় সাধনের ধৈর্য্যচুতি হবার উপক্রম। শ্যামাচরণকে সম্বোধন করে কটু কণ্ঠে সাধন বলল, "আর দেরী করেন কেন? এবার শুরু করুন, আমাকে তো বাড়ী ফিরতে হবে। বাড়ীতে আমার মেয়ে যখন তখন হয়ে আছে, যে কোন সময় সন্তান হতে পারে।"

সাধনকে অব্যাহতি দেবার কোন মতলব ছিল না শ্যামাচরণের, অথচ, গর্ভ-যন্ত্রণায় কাতর কন্যাকে বাড়ীতে ফেলে রেখে পুলিশকে পাহারা দেবার জন্য সাধনকে বসিয়েও রাখা যায় না।

সাধনের অস্থিরতার জন্য শ্যামাচরণ দ্রুত কাঁচের গেলাসে এক গ্লাস চোলাই মদ ভর্তি করে অর্জুন সিং-কে বলল, "থোড়া সরাব পি লে অর্জুন, তবিয়ৎ চাঙ্গা হো যায়ে গা।"

চোলাই-এর চারুগন্ধে গামছায় নাক চেপে অর্জুন সিং বলল, "কভি নেহি। মাফ্ কর্ শ্যামা, হামি ও সব ছোবে না। তবে ঝোল ভি দিজিয়ে, ও হাম পিয়া সক্তা।"

দফাদার শ্যামাচরণের দিকে তাকাল। শ্যামাচরণের বাঁকা হাসির ভৎর্সনা ঝরে পড়ল বেরসিক অর্জুন সিং-এর উপর।

পান ভোজনের অকারণ বিলম্বে অধীর দফাদার শ্যামাচরণকে বলল, "সিংজীর কথা ছাড়েন, খৈনী ছাড়া অন্য নেশা নাই। আপনি সেবা করেন, আর আমাকে পেসাদ ত্থান্।" 'বলছিস'—বলেই বড় কাঁচের গেলাসে প্রায় এক গেলাস মদ ঢেলে ঢক ঢক করে টেনে দিলেন শ্যামাচরণ।

তেঁতো-হাকুচ মুখের স্বাদ, মুখের চামড়া গেল গুটিয়ে, চোখ বুজল শ্যামাচরণ, মিট্ মিটিয়ে কাঁপে চোখের পাতা। প্রসাদ পানে ছুঁচোর মত মুখ করে দফাদার নিমীলিত নয়ন শ্যামাচরণের দিকে তাকিয়ে রইল।

চারদিক নিস্তব্ধ। হ্যাজাকের গোঙানী। চোখ খুললেন শ্যামাচরণ। চৌখস নেশায় আরক্তিম সে শ্যাম-নেত্র।

দফাদার দেখল যে লাল টুক টুকে শোল মাছের চারার মত শ্যামাচরণের চোখের মণি কল্‌কল্-খল্‌খল্ করে এধার ওধার ছোটা-ছুটি করছে।

ঝোলে ভিজিয়ে একটা মুরগীর ঠ্যাং শ্যামাচরণের হাতে ধরিয়ে দিল সাধন। শিয়ালের আখ-চিবানো করে শ্যামাচরণ মুরগীর ঠ্যাং খেতে লাগল।

অর্জুন হাতায় করে সামান্য ঝোল মুখে দিয়ে ঝালে 'উঃ আঃ!' করে উঠল। সাধন গুটি গুটি হাত বাড়িয়ে থাবা-ভর মাংস নিয়ে মনের সুখে খেতে লাগল।

পুনরায় এক বড় পাত্র টেনে শ্যামাচরণ ঝোলের কড়াই-এর উপর ঝুঁকে পড়ে আবার একটা মুরগীর ঠ্যাং তুলে নেয়।

শ্যামাচরণ ঢুলছে, মাংস চিবোনোর তালে তালে কি যেন সব দ্রুত ভেবে চলেছে।

হঠাৎ শ্যামাচরণ 'আঁ' করে আর্তনাদ করে উঠল। নিরামিষে অভ্যস্থ শ্যামাচরণের একটি প্রৌঢ় বয়েসের দাঁত মজ্জার আস্বাদ পেতে চেষ্টা করায় কনকনিয়ে কড়াৎ করে কক্ষচ্যুত হল। শ্যামাচরণের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

শ্যামাচরণ সাধের মুরগীর ঠ্যাংসহ মৃত দাঁত ছুঁড়ে ফেলে দিল। ক্ষতস্থান চিন-চিনিয়ে জ্বলে উঠল। শ্যামাচরণের বেকুব ঠোঁট বেয়ে সরক্ত সুরুয়া সুরসুর করে বেরিয়ে এল।

অর্জুন সিং খৈনী চুন ঘসতে ঘসতে হা-হা করে হেসে উঠল।

দাঁত ভাঙা সিপাই-এর জন্য সাধনের কষ্ট হলেও তা ক্ষণিকের। এর পর শ্যামাচরণের মাংস চর্বণ করা আর সম্ভব নয়, এক কড়াই মাংসের ঝোল তার কপালেই নাচচে।

শারীরিক যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই শ্যামাচরণের বেশী। দাঁত নড়ছিল, পড়তই, তবে এমন বি-হিসেবী খসে পড়াটা নির্লজ্জ বেইমানী।

রসাঙ্কুর সবে গজিয়ে উঠছিল, দাঁতে রস বসি বসি করছিল, হঠাৎ না বলা-কওয়া করে দাঁতটা ধরাশায়ী হল। তাও সহ্য হয়, কিন্তু দু-দুটো মুরগীর মাংস সটান দফাদারের পেটে সমাধি লাভ করবে, কেমন করে শ্যামাচরণ তা সহ্য করে! সুতোয় বাঁধা ফড়িং এর মত ধড়ফড় করে শ্যামাচরণের বুক।

গভীর দুঃখে দ্রবীভুত শ্যামাচরণ আর এক পাত্র মদ আচমকা চোঁ করে টেনে নিয়ে সখেদে বলল, "সাধ্না, মাংসতো বাপু খেতে লারবো, পাতা চাপা কপাল তোর, তোর ভোগেই আছে।" তারপর চোখ বুজে আপন মনে দুলতে লাগল শ্যামাচরণ।

সাধন ডাকল, "শুনছেন, তাহলে আমি চলি, কাল সকালে না হয় একবার দেখা করবো।" সাধনের প্রস্থান প্রস্তাবে আতঙ্ক কাহিল কণ্ঠে শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করল—"সত্যি সত্যি! নকশাল, টকশাল আসবে নাতো?"

দফাদার এক প্রস্থ হেসে বলল, "খেপেছেন, আপনারা জল জ্যান্ত হাজির থাকতে কেউ কি এ পথ হাঁটে! ধরাচূড়ো ছেড়ে প্রেম্সে নিদ্রা যান। কাল সকাল বেলা আমি খপর করে যাব।"

"যাবি? যা"—বলে দফাদারকে বাড়ী যাবার অনুমতি দিয়ে শ্যামাচরণ ঝোল পানে রত অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে জড়িত কণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করে—'কিরে অর্জুন, ভয় লাগতা? আভি বার দরজার খিলভি লাগিয়ে আয়।'—

সাধন দফাদার তু-তুটো মুরগীব মাংস হাঁড়িতে ভরে টপ করে দরজা খুলে চলে যায়।

শ্যামাচরণের আদেশ পালন করে এসে অর্জুন দেখে শ্যামাচরণ বোতলে মুখ লাগিয়ে চোখ বুজে মাল টানছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "আভি কেয়া করেগা শ্যামা?"

কুঁচবরণ চোখ মেলে শ্যামাচরণ বলল, "প্রেমসে শো যা অর্জুন।"

মাতাল শ্যামাচরণের ব্যাপার স্যাপার মোটেই সুবিধার নয়। ডাকাত দলের সঙ্গে অর্জুন কি একাই লড়বে? ওরে বাবা! অর্জুন সিং ভয়ে জুজুমানা।

শ্যামাচরণ কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বমির চাপ রক্ষায় যত্নবান শ্যামাচরণের কপালের শিরাগুলো বিদ্যুৎ-এর মত এঁকে বেঁকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই বমি ক'রে শ্যামাচরণ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। লাল চোখ ফেটে তু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এসে মিশল বমির সঙ্গে। তবুও শ্যামাচরণের হুঁস্ গেল না।

পরণের গেঞ্জি খুলে বমি মুছে শ্যামাচরণ দেখল—অর্জুন সিং ড্যাবডেবিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অর্জুন তখন মনে মনে বলছিল, "কেয়া বিল্লিকা মাফিক জান্‌রে বাবা, দাঁত গেল, বমি ভি করল, তবু বেটা উঠকে বৈঠা!"

গা গোলানি ভাব সামান্য কমে আসতেই শ্যামাচরণ অর্জুন সিংকে ধড়াচূড়া ছেড়ে বিছানা তৈরী করতে বলে বলল, "ডাকাত টাকাত আউর নেহি আসেগা, পুলিশ কা গন্ধ পায়া হ্যায় ও লোক···দাঁতকে লিয়ে বড যন্ত্রণা হোতা হ্যায়,···এক কাম কর অর্জুনভাই, বন্দুক গোলি মাচার উপর রেখে, শো যা।"

শ্যামাচরণের নির্দেশ পালনে অর্জুনের বিশেষ আপত্তি দেখা গেল না। কাঁহাতক্ আর বন্দুক কোলে করে বসে থাকা যায়—তবুও জিজ্ঞাসা করল—"যদি ডাকু লোক হামলা করে?"

বমনক্লান্ত শ্যামাচরণ সুর সুরিয়ে তুলে তুলে কেত্তনের ঢঙে বলল—'ডাকাত ডাকাত করিস সবে, ডাকাত নয় কো কোন প্রভু ?'

মোদের ডাকাতি কর্ম, ডাকাতি ধর্ম, ডাকাতি ছাড়া মোক্ষ কখনও হয় কভু ?

সবই রামচন্দ্রজী কী লীলা রে অর্জুন, তোম হাম নিমত্ত মাত্র। যা হবার তা হনে দো—তোম্ আভি নিদ্ যা।'

শ্যামাচরণের উপদেশামৃত পানে ভয়বিহ্বল অর্জুনের দিকে একবার মিট্‌মিট্ করে চেয়ে শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করল, "কুচ সম্‌ঝা ?"

অর্জুন ঘাড় নেড়ে বলল, 'মালুম নেহি।'

শ্যামাচরণ তার বাণী বৃথায় ব্যয়িত হতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলল—'তোম অর্জুন নেহি—তোম হাঁদাবস্ত হ্যায়।'

অর্জুন সিং টিকি নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁহে ?'

এমন সময় হ্যাজাকের কাছে ঢুম্ করে একটি ঢিল পড়ল। মুখের কথা মুখেই থাকল। অতি দ্রুত গুলি বন্দুক মাচায় রেখে যথাস্থানে অর্জুন সিং ফিরে আসতে না আসতেই হ্যাজাকটি দ্বিতীয় ঢিলের আঘাতে কুপোকাৎ হয়ে গোঙানী তুলে নিভে গেল।

অন্ধকারে প্রাচীর টপকে খামার বাড়ীতে ঝুপ ঝাপ লাফিয়ে পড়ার শব্দ হল। অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বোঝা গেল না।

ভয়ে বুলি হারিয়ে হুঁশিয়ার মাতাল শ্যামাচরণ কান-কোটারীর মত গুটিয়ে শুয়ে পড়ল। অর্জুনও ব্যাঙের মত পেট ফুলিয়ে অন্ধকারে চোখ কিটি মিটি করে পড়ে থাকল।

একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল দুই ধরাশায়ী শান্তিরক্ষকের নিমীলিত নেত্রে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে অর্জুন চোখ মেলার চেষ্টা করতেই মাথায় খেল এক লাথি। শ্যামাচরণ পায়ের ঠেলা খাওয়ামাত্র হাত-পা ছড়িয়ে মড়ার মত মারের অযোগ্য হয়ে পড়ে রইল। বেচারা অর্জুন সিং শুধুমাত্র মেদ বাহুল্যের অপরাধে মার খেল বেশী। জড়বৎ

মাংস পিণ্ডে লাথি মেরে কালক্ষয় করা বৃথা জ্ঞানে ডাকাতের দল গুণধর গনাই-এর মৌচাকে ধুনো দিতে ধাবিত হল।

চারিদিকের কৃষ্ণকায় নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গনাই গিন্নীর আর্ত রব—'ওগো কে কোথায় আছ, বাঁচাও'—সোজা এসে শ্যামাচরণকে বধির করে তুলল। পর পর কয়েকটা বোমা ফাটল।

মাংসের গন্ধে অন্ধ বিড়ালটি বোমার আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে লাফিয়ে মাচায় উঠতে গিয়ে বন্দুক সহ নীচে পড়ে গেল। শ্যামাচরণের আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার উপক্রম করল। আর্তনাদ চরমে উঠল।

হুড়মুড় করে হুড়কো খুলে ডাকাতের দল খিড়কী দরজা খুলে চলে গেল। আর্তনাদ করুণ কান্নায় ভেঙে পড়তে থাকল।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে উঠে বসল দুই সেপাই। তারপর অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বন্দুকগুলি বুকে ধরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

কাঁপুনি থামিয়ে শ্যামাচরণ ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "ভোর হবার আগেই, চল কেটে পড়ি, সকাল হনেসে গাঁয়ের পাবলিক এ্যায়সা ধোলাই দেগা, তো অর্জুন তোম্ বাপের নাম ভুল যায়েগা।"

অর্জুনের আশঙ্কা আরও জটিল। বড়বাবুকে কি কৈফিয়ৎ দেবে। হাতের বন্দুক কোলে করে ডাকাতি হতে দেখল। হাঁও মাও করে কেঁদে উঠে অর্জুন বলল, "আভি আমার নোকরী চল্ যায়েগা, হামারা বালবাচ্ছা মর যায়েগা শ্যামা।"

শ্যামাচরণের অবস্থাও তথৈবচ। দেশে নাই জমি-জমা, সংসার চলতো বিড়ি বেঁধে। নেহাৎ পুলিশের চাকরী পেয়েছিল বলে দুবেলা ভাত মুখে যায়। চাকরী হারালে স্বখাত সলীলে ডুবে মরা ছাড়া গতি নাই। শ্যামাচরণের লোমাগ্রে সঞ্চিত ঘর্মবিন্দু শীতল শিশির বিন্দুতে রূপান্তরিত হল।

চোখের জল মুছতে মুছতে অর্জুন সিং আধমরা গতর নিয়ে আলগোছে বন্দুক কাঁধে তুলে শ্যামাচরণের পিছু পিছু গনাই-এর খামার বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়ে অন্ধকারে নিষ্ক্রান্ত হল।

প্রহৃত ভগ্নদেহে দুই নড়বড়ে সিপাইকে, সূর্য উঠলে, পুরন্দরপুর

ঢোকবার মুখে বনকাপাসীর মাঠে লুটো পুটি করে পড়ে যেতে দেখা গেল।

ঘামে গরমে, ধুলোবালিতে ক্লিষ্ট, বিশৃঙ্খল বেশবাসে শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং পুরন্দরপুর থানার দিকে এগুচ্ছে। গালফুলো শ্যামাচরণের মাথাটা এক আঁটি কটা তালের মত দেখাচ্ছে, অষ্টাঙ্গ খসে পড়ছে যন্ত্রণায়, কাঁধের বন্দুকটা মনে হচ্ছে শাল গাছের গদি। এই মূহূর্তে যীশুখ্রীষ্ট শ্যামাচরণ। বন্দুক বুকে ধরে নিশ্চিত বধ্যভূমি থানার দিকে শ্যামাচরণ প্রতি মুহূর্তে স্খলিত চরণে এগিয়ে চলেছে।

নির্বাক অর্জুন সিং মনে মনে রাম নাম জপে। হঠাৎ ডায়ারের মূর্তি ভেসে ওঠে অর্জুনের মনের মুকুরে, দুর্বোধ্য মাতৃভাষায় সরব স্বরলিপিতে উচ্চকিত হয়ে উঠল অর্জুন।

সকালে সময়মত চা না পেয়ে বিগত রজনীর অসফল ঘুমের হ্যাং-ওভার ভাবটা বড়বাবুর মনে কেমন যেন বিস্ বিস্ করছিল। থানাতে পা দিয়েই একজন কনেস্টবলকে চা আনতে বলে পরম বিরক্তিতে ঠ্যাং জোড়া টেবিলের উপর তুলে অবহেলায় ছড়িয়ে দিলেন। বড়বাবুর দৃষ্টি পড়ল সামনের দেওয়ালে টাঙানো মহাত্মা গান্ধীর ছবির উপর।

মহাত্মাজী চশমার ফাঁক দিয়ে সস্নেহে চেয়ে আছেন বড়বাবুর দিকে, যেন চা-পান বাতিক নাতির দুরবস্থা উপভোগ করছেন। টেবিল থেকে নীচে পা নামিয়ে বড়বাবু চায়ের আশায় সামনে তাকাতেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত, শিহরিত ও অবশেষে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ঝড়ে-ভাঙা-ডানা করুণ বকের মত কোল কুঁজো হয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে থানায় ঢুকছেন গুণধর গনাই। তাকে অনুসরণ করছে ঠিক দশ হাত পিছনে দুই রণক্লান্ত সিপাই ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে।

উত্তেজিত দারোগাবাবু ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। বড়বাবুকে সামনে পেয়ে সাষ্টাঙ্গে তার পায়ে নিজেকে নিক্ষেপ করে গুণধর গনাই কাটা পাঁঠার মত ছটফট করে উঠল।

শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং এসে বন্দুক নামিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাবী মৃতদেহকে গার্ড অফ অনার জানাল।

ক্ষোভে দুঃখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন গনাই মশায়। দলিত জড়িত কণ্ঠে গনাই মশায় বড়বাবুকে অনুযোগ করলেন, "এ-কেমন সেপাই মশায়, বন্দুক টোটা নিয়ে ঠাই বৈঠকখানায় বসে থাকল, একটা ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করল না! ও, হো, হো" কান্না —তিনটে পৈঠা ভেঙে আছড়ে পড়ল। মদ মুরগী গিলে নাক ডাকিয়ে বীর পুঙ্গবেরা ঘুমিয়ে পড়ল, বুক ফাটা চিৎকারেও ওদের মুখ ফুটে আওয়াজ বেরোলো না!

গুণধরের হাহা রবে উত্তেজিত বড়বাবু প্রহরারত কনেস্টবলকে শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং-এর বন্দুক দুটি জমা নিয়ে ওদের হাজতে ভরবার আদেশ দিলেন।

কনেস্টবল রাম সিং-এর হাতে বন্দুক জমা দেবার আগে সর্বশক্তি একত্রিত করে শ্যামাচরণ স-বন্দুক দারোগাবাবুর পায়ে পড়ে বুট জুতোর ডগে মাথা ঠুকে বললে, "হুজুর! আপনি মারুন, কাটুন, হাজতে দেন, কিন্তু চাকরী খেয়েন না হুজুর।"

বড়বাবু সক্রোধে বললেন, "হুঃ, চাকরীর যে বহর দেখালি এর-পরও চাকরী চাস্ কোন মুখে?"

বড়বাবু জুতোর ডগে ওদের হাটিয়ে দিয়ে রামসিংকে ওদের হাজতে পোরার জন্য ইঙ্গিত করলেন। ভূমিতলে শায়িত দুই শান্ত্রীকে নিরস্ত্র করে দুহাতে দুজনকে ধরে টানতে টানতে রামসিং হাজতে নিয়ে গেল।

সেপাইদের হাজতে পোরা পর্যন্ত গুণধর গনাই তার কান্না মুলতুবি রেখেছিল, ওরা চলে যেতেই গোছা গোছা গয়না-গাটি, টাকার তোড়ার শোক উথলে উঠলো।

গুণধর মনে মনে ভাবতে থাকল নিশ্চয়ই দারোগাবাবুর সঙ্গে ডাকাতদের আঁতাত আছে, তা না হলে বেছে বেছে কেন দুটো কানা হনুমানকে তার বাড়ী পাহারা দিতে পাঠালো? নিশ্চয়ই দারোগা-

বাবুর সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগ আছে। ক্রমে গুণধরের কান্নার সুরের গুণগত পরিবর্তন ঘটল। ধীরে ধীরে দারোগাবাবুব বিরুদ্ধে অনুযোগ ফুটে উঠল গুণধরের কণ্ঠে।

ঘটনাবলীর আকস্মিকতায় চায়ের কথা ভুলে গিয়েছিলেন দাবোগাবাবু। দোকানদার নিজে এসে বড়বাবুকে চা দিয়ে যাওয়ায় দারোগাবাবুব চমক ভাঙল। চায়ে চুমুক দিয়ে বড়বাবু ভাবলেন— যা-হবাব তা হয়েছে, ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পবে মেটালেও চলবে, আপাততঃ গুণধরকে কিছু সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করে বাড়ী পাঠাতে পারলে হয়।

এমন সময় দারোগাবাবুর মোলায়েম মেজাজটা থেঁথলে দিয়ে জনপ্রতিনিধি বজতবাবু তাঁর আসামীব জামিনের তদারকীতে থানায় এসে হাজির। ঘরে ঢুকে বড়বাবুকে কোন সম্ভাষণ পর্যন্ত না করে রজতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ব্যাপারটা কতদূর এগোল।"

জল ভরা চোখে গুণধর এম এল. এ. সাহেবের দিকে চায়।

জনপ্রতিনিধি গুণধরের নয়নভরা জল দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে ?"

গুণধর তাব কাহিনী শুরু করবে এই আশঙ্কায় চায়ের কাপে দ্বিতীয়বার চুমুক না দিয়ে বডবাবু বললেন,"হবে আবার কি ? ডাকাতে সব নিয়েছে। তুজন সিপাই পাহারা দিতে পাঠিয়েছিলাম, মদ মাংস খাইয়ে তাদের বেহুঁস করে ফেলে রেখেছিল, ফলে যা হবার তা হয়েছে,"—কথাগুলি বলেই বড়বাবু গুণধরকে ধমকে উঠে বললেন, "যান্ যত সব অসভ্য তালকানা লোক, নিজের ভাল মন্দ জ্ঞান নেই।"

ধমকানী খেয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে গনাই মশায় উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা চললাম, তুমি কেমন দারোগা আমি দেখছি, ভুলে যেও না, বাবারও বাবা আছে।"

দারোগাবাবুর মুখের সামনে বাবা তুলেই কথা। অনুমতি ছাড়াই রামসিং গনাই মশায়কে হিড়্‌হিড়্ করে টেনে থানা থেকে বের করে দিল। বড়বাবু দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—"যাও, বাবার কাছেই যাও।"

.দারোগাবাবুর কথার ধরণ শুনে রজতবাবু কেমন যেন নরম হয়ে গেলেন। মৃদু গলায় ঘাড় চুলকে বড়বাবুকে বললেন, "আমার কেস্‌টা কতদূর কি হল ?"

দারোগাবাবুর তেঁতো মেজাজটা আরও চট্‌কে গেল। তিক্তকণ্ঠে বড়বাবু উত্তর দিলেন, "ক-বার বলবো, জামিন হবে না। অহেতুক যখন তখন এসে সরকারী কাজে বিঘ্ন ঘটান কেন ?"

প্রত্যাখ্যাত জনপ্রতিনিধির অপমানবোধ ভিতর ভিতর ফুঁসে উঠল। প্রথমেই মনে পড়ল ঠাকুরের কথা—ফোঁস করতে ছেড়ো না। কিন্তু সরকারের গঠনতন্ত্রের কি মহিমা—ফোঁস করাও বিপদ, আশ্চর্য ! সরকার আর দলের কাঠামো একই। সেই উপর থেকে নীচে—সবার নীচে সবার পিছে সব-হারা। কই তিনিও তো দল-সম্পাদককে বলতে পারেন নাই—খুনের আসামীর জামিনের জন্য দারোগাবাবুর উমেদারী করা জনপ্রতিনিধিব শোভা পায় না।

রজতবাবু নিজেকে খুঁজে পান না। হঠাৎ মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে. বৃত্তাকারে দলদলালীর হায়না গুলো হাসে। বজতবাবু তাঁর রগের শিরা টিপে ধরে বাইরে চলে যান।

মনস্তাপে এম. এল. এ. চলে যেতেই বড়বাবু মেজবাবুকে বললেন, "দেখুনতো মিষ্টার বোস. বীর পুঙ্গবেরা গুলি টুলি গুলো ঠিক ঠাক ফেরত এনেছে কিনা ?" উত্তরে মেজবাবু জানালেন ছটি গুলিই অক্ষত আছে। বডবাবু তার সুগন্ধী টাকে বাঁহাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "দেখুন তো কি ফ্যাসাদে পড়লাম, দু-দুটো বন্দুক, ছ-ছটা গুলি থাকতে ল্যাজে-গোবরে হয়ে এল !"

"যা হবার হোক। আমার আর কি? বড় জোর কিঞ্চিৎ বদনাম কিন্তু ওদের চাকরী যাবেই,...কার মুখ দেখে উঠলাম। আমি এখন কোয়াটার্স-এ যাচ্ছি, জরুরী কিছু না থাকলে যেন আমাকে বিরক্ত করা না হয়।" কথাগুলি বলে থমথমে মুখে বড়বাবু থানা অফিস ত্যাগ করলেন।

বড়বাবু ঘর ছাড়তেই হাজত থেকে সকরুণ স্বরে শ্যামাচরণ ডাকল.

"ও মেজবাবু, ··মেজবাবু, বাড়ীতে মাগ-ছেলে মুখ তাকিয়ে বসে আছে, একটা খপর দেন বাড়ীতে।" শ্যামাচরণের আবেদন অর্জুন সিং-এর স-রাম আর্তনাদে ঢেকে যায়।

মেজবাবু মিস্টার কমল বোস সরবে হাজতবাসীদের উদ্দেশে জানাল, "খপর চলে গেছে।"

রামনাম ছেড়ে অর্জুন হাজত থেকে হেঁকে উঠল—"নোকৃরী থাকবে মেজবাবু?"

মেজবাবু নিরুত্তর, নিরুপায়। ইস্কুল মাস্টারী ছেড়ে পুলিশের কাজ নিয়ে কি কুকর্মই না করে ফেলেছেন। সারাদিন খিস্তি খেউড়, মিথ্যে কথা, ঘুষ-দালালী, হায়রে! কমল বোস, কমল বন ছেড়ে এসে মিথ্যে তুই চুল পাকালি।

মেজবাবু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করেছেন, পুলিশ শুনলেই ওরা যেন কথার অন্তরঙ্গ সুরটা বদলে নেয়।

শ্যামাচরণের কণ্ঠে ভাঙা আর্তনাদে বিচলিত বোধ করেন মেজবাবু। কোন উপায় নাই। উদ্বেগে তাঁর কণ্ঠখানি ওঠানামা করে। অধীনস্থ কর্মচারী তিনি, বড়বাবুর খামখেয়ালীপনাকেও আইনের পরচুলো পরিয়ে নিজস্ব বিচার বোধকে শান্ত রাখতে হয়—মনে ভাবেন কমল বোস। আর কিছু দিন চোখ কান বুজে রাখতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, মস্তিষ্কে আর বিবেকের ভুরভুটি কাটবে না। তখন সব চীৎকার আর্তনাদ জল-তরঙ্গের মত শ্রুতিসুখকর হয়ে উঠবে।

এমন সময় কষে স্যালুট ঠুকে ঘরে প্রবেশ করল রাম সিং কনেস্টেবল—হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটি মদের বোতল। বোতলটি টেবিলে নামিয়ে দিয়ে রাম সিং বলল, 'এস. আই. সাহেব বড়বাবুর জন্য পাঠিয়ে দিলেন।'

প্রাইমারী স্কুলের সহ পরিদর্শক সমীর গুপ্ত মাস কয়েক হল পুরন্দরপুরে এসেছেন। সমীরবাবু অবিবাহিত, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। মুখে হাসি-খিস্তি এক সঙ্গে লেগে থাকে। রাস্তা ঘাটে পরিচিত লোকজনদের বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন।

প্রায়ই ওনার বাড়ীতে পার্টি বসে। দলনেতা থেকে সুরু করে, পুরন্দরপুরের সব হোমড়া চোমড়া সরকারী কর্মচারী. এমনকি অবসরপ্রাপ্ত জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকও নিয়মিত উপস্থিত থেকে নৈশ পান ভোজনের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

মাঝে মাঝে কোলকাতা থেকে সমীর বাবুর বন্ধু-বান্ধবীরা আসেন। সেদিন ভিড় উপচে পড়ে।

মেজবাবুও যে সমীর বাবুর সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করেন নাই, তা নয়, কিন্তু জমেনি।

টেবিলে রক্ষিত উত্তেজক পানীয়ের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মেজবাবুর কাঁচুমাচু মুখের বলিরেখা ঢেউ-এর মত ছড়িয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবলেন, এ দ্বিপ্রহরে বিলিতি মদের আহুতি দানে হয়তো বড়বাবুর বদ মেজাজ ভিজিয়ে বশে আনা যাবে।

রাম সিংকে হুকুম করলেন মেজবাবু, "ওটা জল্‌দি বড়বাবুকে দিয়ে এসো, আর ফেরার পথে শ্যামাচরণের স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য থানায় আসতে বল।" রাম বিলিতি মদের পাঁইট বগল দাবা করে নিয়ম মাফিক স্যালুট ঠুকে চট্ জল্‌দি বড়বাবুর কোয়াটার্সের দিকে চলে গেল।

মেজবাবুর খেয়াল হল, শ্যামাচরণদের কর্তব্যে অবহেলাজনিত রিপোর্ট এখনো লেখা হয়নি। মেজবাবু কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

আড়ালে দৈনিক পত্রে মুখ ঢেকে ধড়াচূড়া পরে পাথরের মূর্তির মত ড্রয়িং রুমে বসে আছেন বড়বাবু। চোখ জোড়া লেপটে আছে শুখনো অক্ষরে ভরা কাগজে, মাথা টন্ টন্ করছে, মাথার শিরায় যেন রক্ত চলাচল বন্ধ। মেজাজটাই গেছে খিঁথ্‌লে।

এমন সময় রাম সিং যথারীতি সেলাম করে টেবিলে বোতলটি নামিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

বোতল বন্দিনী সঞ্জীবনী সুধার মহিমা অমৃত সমান। ধীরে ধীরে কাগজের আড়াল অপসৃত হল। বোতল দর্শনে বড়বাবু রুক্ষ বিবর্ণ

ঝোলা গাল ঝিকুমিকিয়ে খুশিতে গলকম্বলের মতো দুলে উঠল। ঘোলাটে প্রৌঢ় চোখে বড়বাবু যেন নূতন নীহারিকা পুঞ্জ আবিষ্কার করলেন। ত্রস্ত চরণে আলমারী থেকে একটা কাঁচের গ্লাস বের ক'রে পরম সোহাগে কুর কুর কর্ক কেটে পুরো দু-পেগ এক চুমুকে টেনে মাথার টনটনানির সলিল সমাধি ঘটালেন।

আঃ! উষ্ণ তরল সুখ ধীরে ধীরে সংক্রমিত হল দারোগা বাবুর দেদীপ্যমান শ্লথ শিরা উপশিরায়।

তৃতীয় পেগ ঢেলে নিয়ে গ্লাস হাতে আলমারীর আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন বড়বাবু। বেল্ট বাঁধা, পেট,-মোটা বুক সরু ঝোলাগাল প্রৌঢ় দীনেশ রায়ের প্রতিমূর্তি ফুটে উঠল আয়নার বুকে। গ্লাস হাতে চোখ কচলালেন বড়বাবু। নিজের চেহারা দেখে নিজেই বিরক্ত হয়ে ছলাৎ করে এক পেগ মদ ছুঁড়ে মারলেন প্রতিবিম্বিত নিজের মুখে,—মদের স্রোতে ঢাকা পড়ল চোখ মুখ। শূন্য গেলাসে পুনরায় মদ ঢাললেন। সোফায় পড়ে থাকা টুপিতে টাক ঢেকে গপ্‌ করে মদটুকু গিলে, মোহন বাঁশি কালো ব্যাটন্‌ হাতে, জুতোর খট্‌-খটানিতে পদমর্যাদার আভিজাত্য ফুটিয়ে, বাইরে লাল সুরকীতে কড়-কড় মড়মড় সংগীত তুলে থানায় হাজির হতেই রাম সিং সিপাই জুতোর গোড়ালি ঠুকে স্যালুট দিয়ে এটেন্‌শন্‌ হয়ে দাঁড়াল।

রাজকীয় মহিমায় হাল্কা চালে কুর্ণিসের অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে বড়বাবু চেয়ারে বসামাত্র শ্যামাচরণ পত্নী অমিয়বালা তারস্বরে কেঁদে উঠে, জোড় হাত করে, বড়বাবুর সামনে হাঁটু ভেঙে বসে বললেন, “আমার স্বামীকে ছেড়ে দেন হুজুর, ও কিছু জানে না হুজুর, তুমি আমার বাবা মা হুজুর।”

নারীর বিলাপ ধ্বনিতে কুঞ্চিত ভুরু বড়বাবু স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে মেজবাবুর দিকে তাকালেন।

বড়বাবু ডায়ার সাহেবে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগে অপেক্ষমান মেজবাবু উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিয়ে নিবেদন করলেন, “ইয়োর এক্সসেলেন্সি! এই হতভাগ্য রমণী আপনার অধীনে নিযুক্ত ক্ষুদ্র

কনেস্টেবল শ্যামাচরণের পত্নী, স্বামী শ্যামাচরণের জীবন ও জীবিকা রক্ষার্থে.মহানুভব ডায়ার সাহেবকে স্মরণ করছেন।"

মেঘলা ভাদরে অবেলায় গেঁদিয়ে ওঠা মাছের মত চাপা হাসি খলখল করে ছড়িয়ে পড়ল ডায়ার সাহেবের মুখময়। উদ্বিগ্ন মেজবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

মেজবাবুকে উদ্দেশ্য করে ডায়ার সাহেব বললেন, "ইউ সী মিস্টার বোস, শ্যামাচরণ নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছে, ইম্‌পশি-ব্‌ল, ওদের চাকরী থাকবে না।"

বড়বাবুর রায় শুনে মুখ থুবড়ে মূর্চ্ছা গেল অমিয়বালা। মেজবাবু বড়ই বিব্রত হয়ে উঠলেন, মৃগীরোগ আছে জানলে অমিয় বালাকে থানায় আসতে বলতেন না। মৃগী রুগী দেখে ডায়ার সাহেবের ব্লাক-নাইট হুয়িস্কিতে ভেজা নরম মেজাজটাই বুঝি ঘেঁটে যায়।

থানার মেঝেতে দাঁত কট্‌মটিয়ে হাত পা ছুঁড়ে খিঁচতে দেখে আশঙ্কিত ডায়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "ইজ্‌ সী, ডাইয়িং ?"

মেজবাবুর মনে হল আর্ত রমণীর দুর্দশা-মোচনে এবার হয়তো বড়বাবু কিছু একটা করতে পারেন।

বড়বাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শ্যামাচরণদের মত ইডিয়ট পৃথিবীতে দুর্লভ।"

"ছ-ছটা লিভিং বুলেট থাকতে একটাও ফায়ার করল না। অঃ, দে হ্যাব্‌ থ্রোন্‌ ইঙ্ক আপন মাই ফেস্‌।"

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন বড়বাবু। মেজবাবুর মন বলল, নাও অর নেভার। এখন হাল ছাড়লে আর হালে পানি পাবে না। অনুনয়ে নুয়ে পড়া গলায় স্বগতোক্তির ঢং-এ মেজবাবু বললেন, "ধর্মাবতারের করুণাই ওদের বাঁচতে পারে। শক্তিমান ব্যক্তি কি কোন দিন শিশিরে বজ্রাঘাত করেন।"

ডায়ার চোখ বুজে ডাক দিলেন, "রামসিং। শ্যামাচরণদের হাজত থেকে বের করে আনো।"

ডায়ার সাহেবের আদেশ শুনে মেজবাবু ভাবলেন অবশেষে বাবলা গাছে ফুল ফুটল।

সঙ্গাহীন অমিয়বালা মুর্চ্ছাভঙ্গে অবশ চোখে উঠে দাঁড়িয়ে গাত্র বাস ঠিকঠাক্ করে ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন, রাম সিং লক্ আপের চাবি হাতে হাজতের দিকে চলে গেল।

বড়বাবুর টেবিলে নামানো ফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল। এক নজর সে দিকে তাকিয়ে ডায়ার সাহেব ইঙ্গিতে মেজবাবুকে ফোন ধরতে বললেন।

কানে ফোন লাগিয়ে জেলার সদর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করতেই মেজবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। 'ইয়েস্ স্যার' বলে টেলিফোনের শ্বাস রোধ করে বড়বাবুকে বললেন, "স্যার, এই মূহুর্তে এস. পি. আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।"

মেজবাবু দেখলেন ডায়ারের সারা মুখ কাল মেঘে ঢেকে গেল, তারপর শুরু হল বিদ্যুৎ-এর চমক।

"বলে দিন, আমি নেই" আদেশ দিলেন ডায়ার সাহেব।

সামান্য আঁতকে উঠে মেজবাবু ফোন ধরে বললেন, "বড়বাবু এখন নেই। ইয়েস স্যার, নো স্যার, মানে উনি ছিলেন কিন্তু নেই।" অপর প্রান্তে সম্পর্ক ছেদ ঘোষিত হল। টেলিফোন নামিয়ে সন্ত্রস্ত স্বরে মেজবাবু বললেন, "ওরা আসছে স্যার! সঙ্গে এস্ পি., এম, এল, এ অ্যাণ্ড গুণধর গনাই।" ডায়ারের কানে কথা গেল কি গেল না, বোঝা গেল না।

বিধ্বস্ত শ্যামাচরণ বাঁ-হাতে ফোক্‌লা-ফোলা গাল আড়াল করে কোল-কুঁজো হয়ে শম্বুক গতিতে, আর অর্জুন সিং মাথা হেঁট করে টিকি টানতে টানতে কান্না ঝরা রক্ত বর্ণ চোখে জীবন্ত পথ্য রূপে যেন ক্ষুধার্ত খাই হ্যাটসরর গহ্বরে প্রবেশ করল।

সম্মোহিত শ্যামাচরণকে দেখতে পেয়ে শ্যাম সোহাগিনী অমিয়-বালার কণ্ঠে আকুল প্রার্থনা কেঁদে উঠল—"ওগো আমার, তুমি গো, যাবার আগে বারেক তরে মুখটি ফিরে চাও গো।" 'ডায়ারের

পদযুগলের প্রান্তে পোতাশ্রয় প্রার্থী মাস্তুল ভাঙ্গা নৌকার জীর্ণ জাহাজী শ্যামাচরণের কানে সে ডাক পৌঁছাল না।

নিস্তব্ধ আপিস ঘড়িতে ঢং ঢং করে বেলা বারোটা দেওয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। বড়বাবুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কৌতূহলী মেজবাবু কুল কুল করে ঘেমে উঠলেন।

কণ্ঠে বরাভয় জাগিয়ে ডায়ার সাহেব বললেন, "শোন শ্যামাচরণ, অর্জুন, তোমাদের চাকরী বাঁচাবার একটি মাত্র নিদারুণ উপায় আমি বের করতে পারি, যদি আমার আদেশমত কাজ কর।"

মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্তে প্রাণবায়ু যেমন জোর করে ধরে রাখতে চেষ্টা করে ঠিক তেমনি করে শ্যামাচরণ দম্ ধরে অকুতোচিত্তে অঙ্গীকার করে বলল, "হুজুর আজ্ঞা করুন, পথ যত কঠিনই হোক আমরা সে পথ ধরেই বাঁচতে চাই।"

তথাস্তু ভঙ্গিতে হাত থেকে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ডায়ার সাহেব মেজবাবুকে আদেশ করলেন, "ওদের বন্দুক দুটো গুলিসহ হাতে তুলে দিন।" বিনা বাক্যব্যয়ে ডায়ারের আদেশ প্রতিপালিত হল।

এবার শ্যামাচরণদের উদ্দেশ্য করে বললেন ডায়ার সাহেব, "যাও দুজনে মিলে তিন রাউণ্ড করে গুলি করে এসো।"

অমিয়বালা এতাবৎ ঘোমটার আড়ালে হুজুরের ক্রিয়াকলাপ দেখছিলেন, গুলি করার আদেশ শুনে তার দৃষ্টিমায়া দূর হয়। সজোরে কেঁদে উঠে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ওগো যেও না গো, ও মানষুরে দারোগার কথায় নরহত্যা করতে যেওনা গো। চাকরী না থাকে, ভিখ করে খাব, তুমি গুলি ছুঁড়োনা গো।"

বড়বাবুর জলদ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে পত্নী-প্রাণ শ্যামাচরণ অমিয়বালার সকরুণ আবেদনে ফিরে চাইতেও সাহসী হল না। সজল-নয়ন রাম সিং-এর থর্থরিয়ে কেঁপে ওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল, "কিসকা পর গোলী চালায়েগা।"

ডায়ার বললেন, "কিসিকা উপর নেহি, পানীকা অন্দর গোলী চালাও।"

শ্যামাচরণ সাহেবের আদেশ শুনে রুদ্ধগতি, অমিয়বালার মুখে মুচকি হাসি।

মেজবাবু ডায়ার সাহেবের আদেশের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হদিস্ করতে না পেরে, ইঙ্গিতে শ্যামচরণদেব আদেশ পালনে তৎপর হতে বললেন।

সদ্য প্রাণলাভে সঞ্জীভূত শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং বিদ্যুৎ গতিতে বন্দুক কাঁধে তুলে বডবাবুকে সেলাম করে কদম তালে থানার চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত পুকুরের জলে ফায়ার করতে চলে গেল।

দেওয়ালে টাঙানো গান্ধীজীর স্নেহবিহ্বল চাহনী একবার লক্ষ্য করে ডায়ার সাহেব মনে মনে হেসে উঠলেন, ভাবলেন, এ তো সবে মুখসন্ধি, যবনিকা পাতে মুখেব হাসি থাকবে তো বাপুজী। বড়বাবুর মুখের ব্যঙ্গ হাসি লক্ষ্য করে কপালে করাঘাত কবে বিড় বিড় করে অমিয়বালা বলে উঠলেন, "হায় কপাল, যার হাতে বাঁচন-মবণ, শেষ মেস সে লোকটারও মাথা খারাপ হয়ে গেল।" মেজবাবুর প্রতি মুখ-সন্ধির অপেক্ষায় রইলেন।

জ্যৈষ্ঠের দুপুরে পুকুরের মাছগুলি আধ-সেদ্ধ হয়ে পাঁকে মাথা গুঁজে হাঁপাচ্ছিল। বাঁধা ঘাটের তপ্ত সিঁড়িতে বসে শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং গবম জলে বন্দুকের নল চুবিয়ে চোঁ চোঁ কবে তিন দু গুণে ছ রাউণ্ড গুলি চালাল। বুটি কেটে বুলেটেব জলন্ত শীসা কর্দমাঙ্কে নিমগ্ন হল। প্রাণভয়ে মৎস্যকুল এদিক ওদিক ছোটাছুটি সুরু করল। কাল বিলম্ব না করে ওরা পুনরায় বন্দুক কাঁধে থানায় ফিরে ধনুর্ধব ডায়ার সাহেবকে সেলাম কবে দাঁড়াল।

নির্বিকার ডায়ার হুকুম করলেন. "মিস্টার বোস, শ্যামাচরণের স্ত্রীকে বাড়ী যেতে বলুন।"

ভালয় ভালয় গুলি চালিয়ে সশরীরে শ্যামাচরণকে ফিরে আসতে দেখে অমিয়বালার মন শান্ত হয়ে আসছিল, হঠাৎ বড়বাবুর আদেশে মনটা তার কেমন টকে গেল। শ্যামাচরণের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলে শ্যামাচরণের চোখে বলিবদ্ধ অসহায় কাতর-চাহনী

সহ্য করতে পারল না অমিয়বালা। গলা শুকিয়ে গেল, চোখভরে এল জল। কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে কোনদিকে না তাকিয়ে অমিয়বালা থানা অপিস থেকে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ ডায়ার সাহেব রাম সিংকে আদেশ করলেন, "শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং-কে গরাদে ভরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বেঁধে রাখ?" শ্যামাচরণের কাঁধের বন্দুক ধরাশায়ী হল। বিনা বাক্যে শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং মুক্ত গরাদে প্রবেশ করে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল, রাম সিং দেওয়ালে গাঁথা কড়ার সঙ্গে ওদের মজবুত করে বেঁধে ফিরে আসতেই ডায়ার পুনরায় তাকে আদেশ করলেন, "রাম সিং, তীর লে আও।"

তীর ধনুক এল। ডায়ার সাহেব তীরের ডগাগুলো একবার হাত বুলিয়ে পরখ করে, ধনুর্বান কাঁধে গরাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং ধনুকে টঙ্কার দিয়ে শ্যামাচরণদের লক্ষ্য করে তীর যোজনা করলেন।

মেজবাবুর বুক থর থর করে কেঁপে উঠল।

গুন টেনে তীর ছুঁড়লেন ডায়ার সাহেব। তীর সোজা শ্যামাচরণের পশ্চাৎদেশ বিদ্ধ করল। শ্যামাচরণ কাতর আর্তনাদ করে উঠল।

মেজবাবু ভয় পেয়ে থানা অপিসে ফিরে চোখ বুজে চুল ছিঁড়তে লাগলেন। ডায়ারের পরবর্তী তীর অর্জুন সিং-এর দাবনা ভেদ করল।

যৌথ আর্তনাদে গরাদের ইট বুঝি খসে পড়ে। ডায়ার সাহেবের চোখ জোড়া হায়নার মত জ্বলজ্বল করছে। একে একে বাকি চারটি তীর শ্যামচরণদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে শূন্য ধনুর্বান রাম সিং-এর হাতে অর্পণ করে রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বড়বাবু অফিসের চেয়ারে এসে বসলেন।

ধনুর্বান হাতে রাম সিং থানায় প্রবেশ করে পরবর্তী আদেশের জন্য উপস্থিত হলে বড়বাবু রাম সিংকে শ্যামাচরণদের হাতকড়ি খুলে দিতে আদেশ করলেন।

রাম সিং গরাদে গিয়ে শ্যামাচরণদের হাতের বাঁধন খুলতেই ত্বটি অচৈতন্য দেহ সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল। বহুকষ্টে পাঁজাকোলা করে ওদের বেহুঁশ ধড় ত্বটি গরাদের বাইরে নিয়ে এল রাম সিং।

বড়বাবু কড়কড় করে ডায়াল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মেজবাবু হায় হায় করতে লাগলেন, বড়বাবু যে এত নিষ্ঠুর ব্যাধ তা কে জানতো ? আগে আঁচ করতে পারলে মেজবাবু যেমন করেই হোক বড়বাবুকে এ নিষ্ঠুর খেলা থেকে নিবৃত্ত করতো। ওরা কি প্রাণে বাঁচবে ? হায় ভগবান ! দিন ত্বপুরে চোখের সামনে নরহত্যা দেখতে হল।

ফোনে বড়বাবুকে বলতে শোনা গেল। "হাঁ, এক্ষুণি এ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিন, ভেরি ইমারজেন্ট······থ্যাঙ্ক ইউ।" সশব্দে ফোন নামিয়ে রাম সিংকে ডেকে বললেন, এক বালতি জল নিয়ে গরাদের মেঝে এই মুহুর্তে ধুয়ে পুঁছে সাফ কর।' 'জো হোজুর,' রাম সিং বালতির খোঁজে অফিসের বাইরে গেল।

কিছুক্ষণ থানা অফিস এক পৈশাচিক নীরবতায় ডুবে রইল। নীরবতা ভগ্ন হল থানা হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সের হর্ণে। বড়বাবু ব্যস্ত হয়ে মেজবাবুকে বললেন, "আস্থন মিস্টার বোস, শ্যামাচরণের হসপিটালাইজেশনের ব্যবস্থা করি।" বডবাবু, মেজবাবু আর রাম সিং ধরাধরি করে শ্যামাচরণদের এ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে দিলেন। পুনরায় হর্ণ দিয়ে তীব্র বেগে এ্যাম্বুলেন্স চলে গেল।

মেজবাবুকে থানায় থাকতে বলে বড়বাবু একটি সাইকেলে চেপে থানা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ধোলাই-এ ধরাশায়ী আসামীর পরিবর্তে এক জোড়া রক্তাক্ত আহত সিপাই দেখে চমকে উঠে বড়বাবুর দিকে তাকালেন। বড়বাবু বললেন. "পরে শুনবেন ব্লাডি এনকাউন্টারের কথা। এখন ওরা বাঁচবে কিনা দেখুন।"

শশব্যস্ত ডাক্তারবাবু সংজ্ঞাহীন সিপাইদের হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যেতে তৎপর হলেন।

এমন সময় ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে রাম সিং এসে হাজির হল। বড়বাবুকে সেলাম দিয়ে বলল, "সদর থেকে ডি. এস. পি এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন।"

সংবাদ শুনে বড়বাবুর মেজাজ গরম হয়ে উঠল। হাসপাতালের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বড়বাবু বললেন, "তোমার ডি. এস পি সাহেবকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও, আমার এখন যাবার সময় নেই।" রাম সিং এবার বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বড় সাহেবকে স্যালুট করে পুনরায় সাইকেলে চেপে থানায় ফিরে গেল।

ডাক্তারবাবু দুই অচৈতন্য কনেস্টবলের পশ্চাৎ দেহের ক্ষত মুখে স্থঁচ ফোটাতে ফোটাতে রোগীদের পাদমূলে শয্যাপরি উপবিষ্ট বড়-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,"আঘাত বড়ই তাজা, এ্যাক্‌শন্ কখন হল ?"

বড়বাবু হয়তো কিছু ভাবছিলেন, প্রশ্নটা ঠিক কানে গেল বলে মনে হল না। সেলাই-এর সূতোতে টান পড়তেই শ্যামাচরণের কণ্ঠ থেকে এক 'আঁা' ধ্বনি বেরিয়ে এল। যাক্ ওরা বেঁচে আছে।

বড়বাবু ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি যেন বলছিলেন ?" প্রশ্নোত্তরে ডাক্তারবাবু বড়বাবুর দিকে মুখ ফেরাতেই খোলা জানালার মধ্য দিয়ে দেখতে পেলেন, সদলবলে পুলিশ সাহেব তাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন।

বড়বাবু জানালার দিকে পিছন ফিরে বসে ছিলেন। ডাক্তারবাবু হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় বড়বাবু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে খোলা জানালার দিকে তাকাতেই দেখলেন ডি. এস. পি., বিধায়ক রজত বাবু ও গুণধর গনাই-এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছেন।

মরফিয়ায় হতচৈতন্য শান্তিরক্ষক শ্যামাচরণ আঁা-আঁা শব্দ করে, শ্বাস নেবার জন্য চিবুক তুলে হাঁ করল। এই বুঝি প্রাণ যায়! বড়বাবু দ্রুত শ্যামাচরণের মাথার গোড়ায় ছুটে গিয়ে শ্যামাচরণের সঙ্কুচিত শীর্ণ বুকে হাত বুলিয়ে শ্যাম সুখপাখীকে খাঁচায় ধরে রাখতে যত্নবান হলেন।

পুলিশ সাহেব, সদলবলে অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশ ক'রে সেবারত বড় সাহেবকে দেখে বিস্ময়ে একবার বড়বাবু অন্যবার বিধায়ক রজতবাবুর দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করলেন। কারও কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে পুলিশ সাহেব বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হোয়াই আর ইউ সাইলেণ্ট ম্যান? টেল মি, হোয়াট হ্যাপেণ্ড?"

বড়বাবু বড় বড় চোখ করে এস. পি-র দিকে তাকালেন। তার ত্ব'চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করছে। হতবাক বিধায়ক, বিস্মিত গুণধর গনাই—এ যে দেখি জলে ভাসে শীলা! চোখের জল না মুছে ভেজা গলায় বড়বাবু বললেন, "স্যার, শ্যামাচরণ আর অর্জুন সিং-এর কথা ভেবে আমি কি বলবো, ঠিক কথা খুঁজে পাচ্ছি না।"

অসহিষ্ণু স্বরে পুলিশ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরা আহত হল কি করে?"

বড়বাবুর চোখ থেকে তুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের ত্ব'পাশ মুছে বড়বাবু বললেন, "কি বলবো, শ্যামাচরণ, অর্জুন সিং-এর বীরত্বের কথা ভেবে আমার বুক গর্বে, শোকে আনন্দে ভরে উঠছে। তুটি বন্দুক, ছটি মাত্র গুলি নিয়ে একদল সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মোকাবেলা ক'রে বন্দুক না খুইয়ে, নিদারুণ আহত অবস্থায় থানায় ফিরেছে। উগ্রপন্থীদের তীরের আঘাতে দেহ রক্তাক্ত, ছিন্ন-ভিন্ন, প্রাণে বাঁচার আশা কম। অখ্যাত পুরন্দরপুর থানার সিপাই শ্যামাচরণ, অর্জুন সিং আজ ভারতীয় পুলিশের আদর্শ হয়ে উঠেছে। দেশপ্রাণ শান্তিরক্ষকদের নিজ হাতে সেবা করার গৌরব লাভের আশায় আজ আমি এখানে।"

বড়বাবুর ভাবাবেগের আন্তরিকতায় মুগ্ধ পুলিশ সাহেবকে রজত-বাবু নিম্নকণ্ঠে বললেন, "ওসব গট্ আপ কেস্ স্যার।"

পুলিশ সাহেব শ্যামাচরণদের বীরত্ব-কথা শ্রবণে এতই মগ্ন যে বিধায়কের কথা তিনি শুনতেই পেলেন না।

রজতবাবুর কান-ভাঙানী বড়বাবু কিন্তু ঠিক শুনতে পেলেন, পুলিশ

সাহেবের সামনেই রজতবাবুকে ধমকে উঠে বললেন, "ইউ সাট্ আপ্। স্যার, এই ভদ্রলোক প্রত্যেক দিন সকাল বিকাল আমার কাছে এসে সরকারী কাজে বিঘ্ন ঘটান। মির্জাপুরের কুখ্যাত ডাকাত ইসলাম খাঁ প্রকাশ্য দিবালোকে ল-গাঁয়ের দ্বিজপদ মোড়লের দুই ছেলেকে হত্যা করার অভিযোগে আমি তাকে চালান দিয়েছি। উনি কেবল থানায় এসে ইসলাম খাঁর জামিনের জন্য জুলুম করছেন।" পুলিশ সাহেব রজতবাবুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বিধায়কের বাক্‌রোধ। গুণধর এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিলেন। বড়বাবুর ধমকে স্বপ্নছুট গনাই মশায় হাঁও মাঁও করে বলে উঠলেন, "সব মিথ্যে হুজুর, ওদের কিছু হয়নি, ওরা একটাও গুলি ছোঁড়ে নাই, ওদের গায়ে তীর তো দূরের কথা, টিকটিকিতে এক ফোঁটা প্রস্রাবও করেনি। এসব বড়বাবুর কারসাজি, আপনি পরীক্ষা করে দেখুন হুজুর।"

গুণধরের অভিযোগ শুনে পুলিশ সাহেবের চমকের চটকা কাটে। অভিযোগের সত্যতা জরিপের আসায় পুলিশ সাহেব সকলের মুখের উপর একবার রহস্য-ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বড়বাবুর ধমকানি সহ্য করতে না পেরে লাঞ্ছিত বিধায়কের চোখে-মুখে বিপন্ন-বিস্ময় জেগে উঠল।

তীরবিদ্ধ প্রৌঢ় মরাল শ্যামাচরণের কণ্ঠে কাতর ধ্বনি উচ্চারিত হল। বড়বাবুর চোখে সকাতর চঞ্চলতা ছটপট করে উঠল।

অনুকম্পা তাড়িত চঞ্চল চরণে ডাক্তার অম্বিকা ঘোষাল শ্যামাচরণের শয্যাবর্তী হয়ে পুলিশ সাহেব সানুনয়ে বললেন, "দয়া করে এস্থান ত্যাগ করুন, রোগীর অবস্থা ভাল ঠেকছে না, আমাকে ঠিকমতো চিকিৎসা করতে দিন।"

'সেই ভাল' বলে পুলিশ সাহেব দু'পা এগিয়ে নির্জিত মুদিতনয়ন কনেস্টবলদের এক নজর দেখে বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গট্‌মট্ করে হেঁটে জিপে চড়ে থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

ধমক খাওয়া আবদেরে শিশুর মতো গালে অভিমানের টোল তুলে চোখ কচলাতে কচলাতে গুণধর জিপগাড়ীর পিছু পিছু চলে

গেল। বিধায়ক ও তার অবান্তর উপস্থিতির কথা ভেবে ঘড়িতে সময় দেখতে দেখতে হাসপাতাল ত্যাগ করল।

পড়তি দুপুরে থানায় বসে মেজবাবুর হাত থেকে ধূমায়িত চায়ের কাপ ধরতেই পুলিশ সাহেবের মেজাজ প্রায় প্রসন্ন হয়ে উঠল। একবার গলা ঝেড়ে বড়বাবুর মানবিক আন্তরিকতা প্রশংসা করে বললেন, "আপনার কনেস্টবলেরা সত্যিই বীর। শ্যামাচরণ, অর্জুন সিং-এর চিকিৎসার যেন কোন ক্রুটি না হয়। প্রয়োজন হলে সদর হাসপাতালে এমনকি কোলকাতা পাঠাতেও দ্বিধা করবেন না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু-সিপ চা খেয়ে মৃদু হেসে পুলিশ সাহেব স্বগোক্তির ঢঙে বললেন, "আশ্চর্য মিথ্যেবাদী লোক সব! বড়বাবু, রজতবাবুর কেসটার জামিন দিয়ে দেবেন, যা হবার কোর্টে হোক, বুঝতেই তো পারছেন 'লিভ এ্যাণ্ড লেট লিভ'।" বলেই হাসতে হাসতে উঠে পড়ে যথারীতি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে জিপে চড়ে সদরে চলে গেলেন।

বড়বাবু চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে গান্ধীজীর ছবির দিকে চেয়ে হঠাৎ দাঁত ছড়িয়ে হিংস্র হায়নার মতো হাসতে লাগলেন। হাসি শুনে ভয় পেয়ে মেজবাবু থানা ছেড়ে দ্রুত কোয়ার্টারে চলে গেলেন।

তিন মাস অতিক্রান্ত হল। কৈ-মাছের প্রাণ নিয়ে জন্মেছিল শ্যামাচরণ। স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একদিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল শ্যামাচরণ। তার কটিদেশের ক্ষত স্থানটি শুকিয়ে গেলেও সারাক্ষণ আগ্নেয়শিলার মত শক্ত ও তপ্ত হয়ে থাকে, দৈবাৎ আঘাত লাগলে আত্মঘাতী টন-টনানিতে ছটফট করে শ্যামাচরণ।

অতর্কিত শরাঘাত ও হাসপাতালের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে অর্জুন সিং কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে গেছে, সারাদিন মুখ বেজার করে বসে থাকে।

ছেলে ছোকরার দল পথে-ঘাটে শ্যামাচরণের বঙ্কিম গতিভঙ্গি

নকল করে শ্যামাচরণকে উপহাস করে। স্ত্রীর সাবধান বাণী স্মরণ করে শ্যামাচরণ তার অস্বস্তিকর উত্তেজনায় নিদারুণ উপেক্ষার প্রলেপ চাপিয়ে পাশ কাটায়।

দয়াব শবীব বড়বাবুব কৃপায় শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং-কে বাইবের কোন কাজে বেরুতে হয় না।

রাস্তাঘাটে পরিচিত লোকজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে কোমরে বাঁ হাত বেখে বাঁকা রায় শ্যামাচরণ উগ্রপন্থী গেরিলাদের সঙ্গে তার সম্মুখ যুদ্ধের এক কাল্পনিক কাহিনী পরিবেশন করে। একদিনের যুদ্ধ বর্ণনার সঙ্গে অন্যদিনের কাহিনীব মিল থাকে না। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য প্রতিপাদন করতে করতে শ্যামাচরণের সত্য-মিথ্যা বোধ লোপ পায়।

ত্রয়োদশীর দিন সস্ত্রীক দীঘা ভ্রমণ সেবে বড়বাবু থানায় পা দিতেই শুভ বিজয়াব নমস্কার জানিয়ে মেজবাবু একটি রেজিস্টার্ড চিঠি তাঁব হাতে তুলে দিলেন। প্রতিনমস্কার না কবেই বড়বাবু তৎক্ষণাৎ চিঠির মুখ ছিঁড়ে জেলাশাসকের নিকট প্রেরিত পুলিশ কমিশনারের নামাঙ্কিত চিঠির অনুলিপি পাঠ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মেজবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিশে ফেলবার উপক্রম করলেন। আলিঙ্গনপিষ্ট মেজবাবু বড়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন আনন্দ-কানা বড়বাবুর ভ্রু-জোড়া পেখম তুলে কপাল ছুঁই ছুঁই করছে।

বড়বাবু হাঁক দিলেন, "কৌয় হ্যায়?"

রাম সিং সেলাম দিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বড়বাবু তাঁর হাতে দশ-টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, "মেঠাই লে আও।" বড়বাবুর অচেনা আদেশে বিব্রত রাম সিং সভয়ে মিঠাই কিনতে চলে গেল।

অফিসের বাইরে টুলে বসে শ্যামাচরণ ডিউটি দিচ্ছিল। মিঠাই-এর ঠোঁঙা হাতে বিহ্বল রাম সিং-এর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে মেঠাই লে আয়া?" রাম সিং বিনা বাক্য ব্যয়ে একটি মিঠাই শ্যামাচরণেব হাতে তুলে দিল। চকৃচকে চোখে মুষ্টিবদ্ধ মিঠাই-এর দিকে তাকিয়ে শ্যামাচরণ বলল, "রাম সিং অর্জুনকে দুটো

মিঠাই দিবি, বেচারা ছদিন জ্বরে ভুগছে, মুখে স্বাদ নেই।" রাম হাঁ-না কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

মিঠাই-এ কামড় দিয়েই শ্যামাচরণের মনটা খচ্ করে উঠল। বড়বাবুর মিঠাই এর গুণাগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগল মনে। আতঙ্কিত কণ্ঠনালী শুকিয়ে এল। বিষম খেল শ্যামাচরণ, মুখ থেকে ছিটকে বেরল মিঠাই-এর দলা।

নিজের ঘরে ছোট একটি খাটিয়ায় শুয়ে ছিল অর্জুন সিং। ভয়ে ভেজা হাসি ফুটিয়ে রাম সিং এসে অর্জুন-এর হাতে ছুটো মিঠাই দিয়ে বলল, "বড় বাবুকা বিজয়া মিঠাই খা লে অর্জুন।"

বড়বাবুর মিঠাই শুনে জ্বরে তেঁতো অর্জুনের জিব শুকিয়ে এল। অর্জুনের হাতে মিঠাই ধরিয়ে অবশিষ্ট মিঠাই-এর সংগতির তাগিদে রাম সিং সরাসরি নিজের ঘরে ঢুকে ছুধের কৌটায় অবশিষ্ট মিঠাই বন্দী করে রাখল।

নতোদর অর্জুন সিং নির্জন ঘরে খাটিয়ায় বসে মিঠাই নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবছিল, তীর নির্যাতিত দেহে অবস্থিত ভয়ার্ত প্রাণটি বুঝি বড়বাবুর মিঠাই সেবা করে বেরিয়ে যায়। মিঠাই ছুটি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অর্জুন। একটা কাক এসে ছোঁ মেরে একটা মিঠাই মুখে করে উড়ে গেল। মিঠাই-লোভী কাকের অবশ্যম্ভাবী অপমৃত্যুর কথা ভেবে অর্জুন সিং-এর মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।

বড়বাবু চোখ বুজে চেয়ারে বসে ভাবছেন, হাতের সিগারেট পুড়ছে। মেজবাবু দেখছেন, বড়বাবুর কপালের রেখাগুলি উজান ঠেলে উপরে উঠছে।

"স্যার, ও স্যার" বলে মেজবাবু বড়বাবুর ধ্যানভঙ্গ করে বললেন, "আপনার আকস্মিক উল্লাসের কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না।"

বড়বাবু মৃছ হেসে বললেন, "দাঁড় না টেনেই কূলে ভিড়তে চান মিস্টার বোস। শুনুন, সময় সংক্ষিপ্ত, জরুরী ভিত্তিতে আগামীকালের মধ্যে থানার মাঠে একটা বেশ জমকালো প্যাণ্ডেল খাটানোর ব্যবস্থা

করুন, অনুষ্ঠান হবে। নবীনবাবুর বাড়ী থেকে নূতন সামিয়ানা এনে টাঙান, ঝাড় লণ্ঠনগুলো আনতে ভুলবেন না।"

মিঠাই, প্যাণ্ডেল, ঝাড়লণ্ঠন ব্যাপার কি !

মেজবাবুর চিন্তা, ভাবনা, জিজ্ঞাসা সব যেন-তেন গোল পাকিয়ে গেল। কাজ নেই প্রশ্ন ক'রে। ভালয় ভালয় অনুষ্ঠানটা হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হন মেজবাবু। মেজবাবুকে একরাশ আকস্মিক ভাবনায় ফেলে বড় বাবু কোয়ার্টারে ফিরে গেলেন।

পরদিন সাত সকালে বড়বাবু ঘোষিত মহোৎসবের গৌরচন্দ্রিকা সুরু হল থানার পশ্চিম দিকের খোলা মাঠে। নীল কুর্তা গায়ে থানার চৌকিদার আর দফাদারের দল বাঁশ খুঁটি পুঁততে ব্যস্ত। হাটে যাবার পথে কৌতূহলী পথিকেরা সবিস্ময়ে ম্যারাপ দেখতে দেখতে, কি যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে চলে গেল।

বডবাবুর হেঁয়ালী ধরতে না পেরে মেজবাবুর মাথা টন্‌টন্ করলেও মঞ্চসজ্জার এক চুলও যাতে এধার-ওধার না হয় সেদিকে কড়া নজর ছিল।

সকাল সকাল স্নান সেরে, পরিষ্কার থাকি পোষাকে, মাথায় টুপি পরে মেজবাবুর কহত্ মতো হুটো টুলে মঞ্চ সজ্জার কাজকর্মের তদারকিতে বসল শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং।

আড় চোখে আশ-পাশ দেখে নিয়ে শ্যামাচরণকে ইশারা করে অর্জুন সিং জিজ্ঞাসা করল, "বেপার কি শ্যামজী?"

শ্যামাচরণের মনেও সেই একই প্রশ্ন, তবুও মুখে হাসিটি ফুটিয়ে উত্তর দিল, "ডায়ার সাহেবকো বিবাহ বার্ষিকী, কুচ্ সম্‌ঝে ? মতলব বডবাবু ইসি দিন পর স্বাদী কিয়া।"

অর্জুন সিং সবিস্ময়ে বলল, "কেয়া, বড়বাবু ফিন্ সাদী করেগা ? তুমারা দেমাক গরবর হো গিয়া শ্যামাজী।"

অর্জুনের এই অমূলক আশঙ্কা দূরীকরণের নিমিত্ত শ্যামাচরণ তার তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনী শক্তির প্রসাদে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দানে রত হল। বলল, "গরবর নেহি রে অর্জুন, ভাবিজীসে পুছ্‌লো, বড়বাবুকা বিবি

উনকি ঝিকো বলি থি, আজ ওদের সাদি কা দিন। উস্ ঝি মেরে জানানা কো বলি. আউর তেরা ভাবিজী-নে মুঝকো বলি।"

অর্জুন সিং ঘাড় নাড়তে নাড়তে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এমন সময় কয়েকজন চৌকিদার প্রকাণ্ড বড় এক নীল সামিয়ানা টানতে টানতে উপস্থিত হল।

শ্যামাচরণেরা টুল ছেড়ে থানার পথে পা বাড়াতেই দেখলো এরফান্ মোল্লা একটি নধর ক্লান্তি ছাগলের খাসি গামছায় বেঁধে থানার দিকে এগিয়ে আসছে। সামনে শ্যামাচরণদের দেখে, মোল্লা জিজ্ঞাসা করল, "বড়বাবু কোথা? জবাই করবে কে?" সভয়ে অর্জুন ও শ্যামাচরণ মুখ চাওয়া-চায়ি করল।

এরফান্ দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে খাসি নিয়ে থানার বারান্দায় উঠে মেজবাবুকে জিজ্ঞাসা করল. "খাসি বাঁধবো কোথা?"

মেজবাবু রাম সিং-এর দিকে তাকালেন। রাম সিং গোঁফে মোচড় দিয়ে বলল, "কোথা আর বাঁধবে, ওটাকে হাজতে পুরে দি স্যার।"

মেজবাবু মৌন থেকে এরফানের খাসিটি বড়বাবু না আসা পর্যন্ত হাজতবাস অনুমোদন করলেন।

রাম সিং খাসিটির কান ধরে হিড়হিড় করে হাজতে নিয়ে যেতে থাকে।

হাজতবাসে অনিচ্ছুক প্রতিবাদী অজ কণ্ঠে ম্যা-ধ্বনির কাতর প্রভাবে আতঙ্কিত শ্যামাচরণও মা-স্থলে ম্যা ডেকে সহমর্মিতা প্রকাশ করেন।

এমন সময় স্নান সেরে ঘাড়ে পাউডার মেখে বড়বাবু ফুর-ফুরে মেজাজ নিয়ে চড়ুই পাখির মতো লঘু চালে চেয়ারে এসে বসলেন। মেজবাবু অদ্যকার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব সংক্ষেপে বড়বাবুকে অবহিত করলেন।

আড়াল চোখে শ্যামাচরণ দেখলো আরামে ল্যাজ গুটিয়ে চেয়ারে বসে একটা বাঘ যেন ওরই দিকে জ্বল জ্বল করে চেয়ে আছে। শ্যামাচরণের বুকের ভিতরটা একবার হিল্ হিল্ করে কেঁপে উঠল।

এমন সময় যজ্ঞের খাসিটি হাজত থেকে ম্যা করে ডেকে উঠল। অজকণ্ঠের আর্তনাদ ধ্বনি শুনে বিস্মিত চোখে বডবাবু মেজবাবুর দিকে তাকালেন। মেজবাবু আমতা আমতা করে বলল,"নিরাপত্তার খাতিরে রাম সিং ওটাকে হাজতে রেখেছে, ছেড়ে দেবো স্যার?"

একটা সিগারেট ধরিয়ে মোলায়েম ধূয়ো ছাড়তে ছাড়তে বড়বাবু বললেন, "না. কসাই এলে তার হাতে তুলে দেবেন।" মেজবাবু 'ইয়েস্ স্যার' বলে মাথা নিচু করে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। দেওয়ালে টাঙানো গান্ধীজীর ফটোর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে হাসতে বড়বাবু জবাই-কপালে কয়েদী খাঁসির কাতর কান্নাধ্বনি শুনতে থাকলেন।

দুপুর গড়াতেই নবনির্মিত মঞ্চেব সামনের মাঠে বালতি বালতি জল ছড়িয়ে ঝাঁটা দিয়ে ঝর-ঝরিয়ে রাস্তা মুখো লাল সালুর গেট বানিয়ে চৌকিদারেরা ছুটি পেল।

মঞ্চের পিছনে চটে ঘেরা রসুই শালে মাংস চেপেছে। ভুরভুরে আমিষ গন্ধে অর্ধভোজন সেরে শ্যামাচরণ গুটি গুটি এসে ইশারা করে দোসর অর্জুন সিং-কে কাছে ডাকল।

মেজবাবু মঞ্চের উপর চেয়ার টেবিল ঠিকঠাক বসানো হয়েছে কিনা দেখছিলেন। এক-গা ঘেমে রাম সিং এক জোড়া গাঁদা ফুলের মালা এনে মেজবাবুর হাতে তুলে দিলেন।

বড়বাবুর বিবাহ বার্ষিকী—শ্যামাচরণের রসিকতাটি ইতিমধ্যে নিঃশব্দে কৌতূহলী পুরন্দরপুরবাসীর কণ্ঠে আশ্রয় লাভ করে।

বড়বাবুর জরুরী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে রজতবাবু, বি. ডি. ও, ডাক্তারবাবু, জে. এল. আর. ও, স্ফূর্তিবাজ সাব-ইনসপেক্টর অফ স্কুল্স বাবু ও গুণধর গনাইকে থানা যাবার পথে অনেকেই অনুষ্ঠানের হেতু জানতে চাইলেন, কেউ কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। বড়বাবুর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার বদ অভ্যাস তো কারও নেই।

উগ্র ইস্ত্রী করা ঝকঝকে পুলিশী পোশাকে চকচকে টাক্ ঢেকে,

বড়বাবু পুলিশ দফাদারদের গার্ড অব অনার দেওয়ার জন্য কে কোথায় দাঁড়াবে সে সম্পর্কে দক্ষ চিত্র পবিচালকের মত নির্দেশ দিয়ে শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং-কে বললেন, "অনুষ্ঠান সুরু হলে তোমরা দুজন সামনে দাঁড়াবে।" নির্বিবাদে ঘাড় নেড়ে উভয়ে সম্মতি জানায়।

মাঠের এক কোণে মিশিকালো পোষাক পরে ইয়াকুব শেখের ব্যাণ্ড পার্টি জয় ঢাকের গা চুলকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, "ভালারে ভাই, আমরা কোথা দাঁড়াবো?" একজন বলল, "ঐ দেখ বডবাবু আসছে।" যন্ত্রীরা তাদের যন্ত্রের মতই বোবা বনে গেল। ফ্লুট বাজিয়ে জটাধারী ভোল্লা নিমিষে দণ্ডবৎ হল বড়বাবুর শ্রীচরণে।

পদ-প্রান্তে পতিত জটাধারীর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে বডবাবু ইয়াকুবকে বললেন, "আজ সন্ধ্যায় যখন আমরা গার্ড অব অনার নেবো, সে সময় তোমাদেব ব্যাণ্ডপার্টিকে জাতীয় সংগীত বাজাতে হবে। মনে আছে তো জন-গণ-মন?" ইয়াকুব ভয়ে ভয়ে বলল, "জী হুজুর।"

বাঁ পায়ের বুট জুতো দিয়ে পুরন্দরপুর থানার দাগী ডাকাত জটাধারীকে গুঁতিয়ে দিয়ে বড়বাবু বললেন, "অনুষ্ঠান শেষে দুটো খেয়ে যাস। টাকা পয়সা কিছু লাগবে?" জটাধারী ভূশয্যা ছেড়ে জোড় হাত করে জিব্ কেটে বলল, "কখনও লয়।" নিশ্চিন্ত বড়বাবু গৃহে ফিরলেন।

সুর্যাস্ত হতেই নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ মঞ্চের ঠিক নীচে প্রথম সারিতে বসে নিমন্ত্রণের কারণ নিরূপণে কালক্ষয়ে রত।

শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিং ধোপ দোরস্ত পোষাক পরে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে চক্‌মক্ করে চারিদিকে তাকাচ্ছে। জেনারেটর টেস্টের শব্দ হতেই শ্যামাচরণ কেমন ঘাবড়ে গেল। অর্জুনকে বলল, "রাস্তার ইলেকট্রিক তার থেকে লাইন টানা আছে, তবে জেনারেটর চালায় কেন?"

অর্জুন শ্যামাচরণের কথা শুনলই না। সে ভাবছে রামচন্দ্রজী আজ কোন লীলা দেখাবেন।

কানে মুক্তোর দুল দুলিয়ে, হীরের নাকছাবি পরে বড়বাবুর স্ত্রী,

শ্যামাচরণের স্ত্রী অমিয়বালাকে সঙ্গে করে এনে চেয়ারে বসলেন। স্বামী গরবে গরবিনী বড়বাবু-জায়া মুখে দোখ্‌তা পুরে ঠোঁট টিপে তিক্তমধুর হাসির ছটায় অদূরবর্তী কর্মতৎপর প্রৌঢ় স্বামী বড়বাবুর রক্তের চাপ বাড়িয়ে দিলেন।

দ্রুত পায়ে মঞ্চের ভিতরে প্রবেশ করে বড়বাবু শ্যামাচরণকে বললেন. "গেট্ রেডি।" ইয়াকুব পার্টিকে হেঁকে বললেন, "তৈরী তো?"

শ্যামাচরণ সভয়ে লক্ষ্য করল বড়বাবুর চোখ জোড়া হিংখোর মাছের মতো অস্থির।

এখন সদর রাস্তায় গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠল। বড়বাবু প্রায় ছুটে গিয়ে আজকের প্রধান অতিথি জেলা পুলিশ সাহেবকে সসম্মানে স্যালুট দিয়ে জীপ থেকে নামালেন।

প্রধান অতিথি ও বড়বাবুর মঞ্চে আরোহণ করার সঙ্গে ইয়াকুব ব্যাণ্ডে জাতীয় সংগীতের সুর বেজে উঠল। শ্যামাচরণ, অর্জুন সিং হাত উল্টে কপালে ঠেকিয়ে স্যালুট দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চৌকিদার দফাদারের দল শ্যামাচরণদের অনুকরণে মুঠো হাত কপালে ঠেকিয়ে সম্মানিত অতিথিকে সম্মান জানাল।

যথাবিহিত অভ্যর্থনা ও সম্মান গ্রহণ করে মাল্যভূষিত প্রধান অতিথি পুলিশ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে আজকের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বললেন, "আপনারা অবগত আছেন, দেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ও শান্তিরক্ষায় পুলিশ এ-যাবৎ এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে আসছে। জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রধান স্তম্ভ দেশের পুলিশ বাহিনী। জীবন বিপন্ন করে, চোর, ডাকাত, উগ্রপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী দমনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ পুলিশ জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু। পুলিশের প্রাপ্য সম্মান ও গৌরবদানে সরকার তৎপর। আপনাদের সুপরিচিত, বিশ্বস্ত এ নির্ভীক কনেস্টবল শ্যামাচরণ ও অর্জুন সিংকে সরকার তাদের জনসেবা, শান্তিরক্ষা ও বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ 'শৌর্যচক্র পদক' দান করেছেন।"

ঘোষণা স্তম্ভিত সভার চমক ভাঙে বড়বাবু জায়ার মৃদুমন্দ করতালিতে। এম. এল. এ রজতবাবু সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সময়োচিত করতালি দানের ব্যর্থতা-জনিত ত্রুটি স্খালনে হাততালির ঝড় বইয়ে দিলেন।

ঘোষণা শুনে শ্যামাচরণের চোখের তারার ব্যাস বেড়ে গেল। কান ভোঁ ভোঁ করে উঠল, শিরায় টান বাজল, বাঁ-পাটা ঝিন্‌ঝিনি ধরে ক্রমশঃ যেন ছোট হয়ে আসতে লাগল।

শৌর্যচক্র বিজয়ী স্বামীর নিস্পন্দ ত্রিভঙ্গ মূর্তি দর্শন করে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল অমিয়বালা।

হর্ষধ্বনি নীরব হলে লাল ফিতেয় বাঁধা শৌর্যচক্রের মালিকা হাতে পুলিশ সাহেব, বড়বাবুকে পিছনে রেখে, মর্যাদাপূর্ণ, ভাবগম্ভীর পদক্ষেপে মঞ্চ থেকে অবতরণ করতে লাগলেন। ইয়াকুবের ব্যাণ্ড-পার্টিতে জাতীয় সংগীতের সুর জাগল।

শৌর্যচক্রের দ্যুতির দাপটে আতঙ্কিত চোখে শ্যামাচরণ স্পষ্ট দেখতে পেল জ্যোতিষ্কলোক থেকে মহাশূন্যে পা ফেলে এক বিশালা-কায় কালপুরুষ তারই দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্কুচিত পায়ের ঝিন্‌ঝিনি দ্রুত স্নায়ুকেন্দ্রে সঞ্চারিত হওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল্ শ্যামাচরণ শৌর্য্যচক্র।

শ্যামাচরণের আকস্মিক পতনে পতি-প্রাণা অমিয়বালার বুক ফাটা আর্তনাদ ফেটে আটখানা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মঞ্চময়।

হরিষে বিষাদ দেখে নির্বাক অতিথিকুল, ভয়ে বোবা ইয়াকুবের ব্যাণ্ড।

শ্যামাচরণের বেমক্কা পতনে হত-ইষ্ট বড়বাবু ভূতলশায়ী অচৈতন্য শ্যামাচরণের দিকে নিদারুণ বিরক্তিতে চোখমুখ কাল ক'রে, চাপা চোয়ালে ঘাতকের চোখে চেয়ে আছেন।

বড়বাবুর চোখে ডায়ারের হিংস্র চাহনী ফুটে উঠতে দেখে অর্জুন সিং-এর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অতিথিবৃন্দের

মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ সঞ্চারিত করে জলদগম্ভীর স্বরে আলেকজাণ্ডার ডায়ার আদেশ দিলেন 'এ্যাটেনশন্'।

ডায়ার সাহেবের ডাকের গুণে নির্ঘোষ স্পৃষ্ট শ্যামাচরণের মৃতকল্প দেহে প্রাণের সঞ্চার হল।

বিদ্যুৎগতিতে শ্যামাচরণ অসম পায়ে এ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ডায়ার সাহেবকে স্যালুট দিল। পুলিশ সাহেব শ্যামাচরণের গলায় শৌর্যচক্র ঝুলিয়ে দিলেন। ইয়াকুবের ব্যাণ্ডে পুনরায় বিপুল বিক্রমে জাতীয় সংগীত বেজে উঠল।